সরলা

(সামাজিক উপন্যাস)

প্রকাশ-প্রণেতা—

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক—

মোহাম্মদী বুক এজেন্সী

কলিকাতা।

১৩২৫ সাল

মূল্য—পাঁচসিকা।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ।

১। প্রকাশ—একখানি কবিতাপুস্তক। মূল্য মাত্র ।৵০ আনা। আমরা নিজে কিছু বলিতে চাহি না, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক "নুরনবী" ও 'ধর্ম্মের কাহিনী' পুস্তক প্রণেতা চৌধুরী মোহাম্মদ এয়াকুব আলি সাহেবের একটী মন্তব্য দেখুন—

প্রকাশ—একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক। ইহাতে বহিরাবরণের চাকচিক্য নাই,—ছন্দের ইন্দ্রজাল নাই; ভাষার লীলা-করতবেরও ইহাতে অভাব। বইখানি বনফুলের মত ফুটিয়া সাহিত্য-সংসারের এক কোণে পড়িয়া আছে। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও ইহার বুকে অতি মধুর সুরভি আছে; অখ্যাত হইলেও কবি লুৎফর রহমান সাহেব স্বীয় বীণায় যে সুর যোজনা করিয়াছেন তাহা মুসলমান কাব্য সাহিত্যে অপূর্ব্ব ও নূতন সম্পদ। প্রকাশের কবি দেশ ও সমাজ-বিশেষের উপরে উঠিয়া বিশ্ব-মানবের কথা কহিয়াছেন, বাহির হইতে চক্ষু ফিরাইয়া কবির লীলাক্ষেত্র মানবহৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন এবং অপূর্ব্ব সহানুভূতি-বশে মানবমনের নানা সাধশঙ্কা ও সুখদুঃখের সহিত আলাপ ও খেলা করিয়াছেন।

মানুষের হৃদয় বিচিত্র। তাহাতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত কথা ভাসিয়া উঠে, কত ভাবের লহরী খেলে। তাহার কতক ভাষায় প্রকাশিত হয়, আর কতক অস্ফুট ও অব্যক্তই রহিয়াই যায়। যিনি প্রকৃত কবি, তিনি মানবমনের এই সমস্ত গুপ্ত কথা পাঠ করেন, মূকের মুখে ধ্বনি ফুটান, যাহা বলি বলি করিয়া বলা হয় না, ভাষায় তাহাই ফুটাইয়া তুলেন। প্রকাশের অনেক কবিতায় এই অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয় পাই। মানবমনের অস্ফুট ও সূক্ষ্মসূক্ষ্ম ব্যথা-বেদনার প্রকাশে, ক্ষুদ্র হইলেও, "প্রকাশ" মুক্তার মত মূল্যবান্।

মোহাম্মদ এয়াকুবআলী।

২। পথহারা যন্ত্রস্থ—

ভাষার মাধুর্য্যে বর্ণনার অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে চরিত্রের বিশ্লেষণে পথহারা সমাজের, মানব চরিত্রের হাফটোন ফটো—পথহারার পথপ্রদর্শক। দর্শনি ১।০ সিকা।

প্রকাশক ও বিক্রেতা—মোহাম্মদী বুক এজেন্সী।

এসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য—কোরাণ হাদিসের নির্য্যাস, বক্তৃতা শিক্ষার বিশেষ উপযোগী মূল্য ১ম খণ্ড ১৲ মাত্র।

কনোজকুমারী—কনোজ রাজকুমারীর প্রেমভিক্ষা, সেনাপতি কুতবদ্দিনের প্রত্যাখ্যান ও মোসলেম শৌর্য্য-বীর্য্যপূর্ণ উপন্যাস ৸৹ আনা।

মোহিনী মনসুর—মোসলেম সেনাপতি মনসুরের দৃঢ়তা বীরত্ব, মোহিনীর অপূর্ব্ব প্রেম, প্রেমে উন্মাদনা ও সন্ন্যাসিনী সম্বলিত। মূল্য বাঁধাই ১।৹

উপেন্দ্রনন্দিনী যন্ত্রস্থ—১।৹ ফিরোজা বেগম যন্ত্রস্থ—১।৹

মেহেরুন্নেছা যন্ত্রস্থ—৸৹ দুটী ভগ্নী যন্ত্রস্থ—১৲

হজরৎ বড় পীরের জীবনী—বাঁধাই ৷৷৵৹ আনা।

বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ—আদি আসল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট; জুম্মা ও ঈদের মূল আরবি খোতবা ও তাহার উর্দ্দু বাঙ্গালা অনুবাদ সহ মূল্য ১৲।

বাঙ্গালা ফারায়েজ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদেয় পুস্তক মূল্য ।৵৹ আনা।

নবিনন্দিনী ফতেমা জোহরার জীবনী—মূল্য ৷৷৵৹ আনা।

মালতী—বসন্তের মন্দ মলয়হিল্লোলিত সুরভি, ভাবের রসের ফোয়ারা, ছন্দের ঝঙ্কার, ভাবুকতার উন্মেষ পাইবেন, মূল্য ।৵৹ আনা।

মালা—মুক্তার ন্যায়, বসন্তের ফুলের ন্যায়, ভাব ও ভাষার মালা মূল্য ।৹ আনা।

নীতিকানন—গোলেস্তার ৮ম অধ্যায়ের পার্শি ও বঙ্গাক্ষরে মূলসহ বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৷৷৹ আনা।

সাজ্জাদা বা যোগাসন আধ্যাত্মিক পুস্তক—মূল্য ৷৷৹ আনা।

সচিত্র আরব ইতিবৃত্ত—আরবের বিভিন্ন স্থান ও বিষয়ের ৫০খানি সুন্দর হাফটোন চিত্রসহ আরবের ইতিহাস। মূল্য মাত্র ২৲ টাকা।

ইহা ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার আরবি, উর্দ্দু, বাঙ্গালা কোরাণ শরিফ ধর্ম্মপুস্তক; সকলপ্রকার ইতিহাস, জীবনী, উপন্যাস, ও ইসলামী বিষয় সম্বলিত পুস্তক পাওয়া যায়। অর্ডার পাওয়া মাত্র সরবরাহ করা হয়।

ম্যানেজার—মোহাম্মদী বুক এজেন্সী।

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা—

২৯নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সরলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

——:০:——
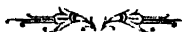
মিঃ মর্ণোর বড় ছেলে উইলিয়ম, বড় ঘরে জন্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহার বাল্যকালটা বড় কষ্টে গিয়াছে। পিতার প্রকাণ্ড জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইলেও মর্ণো আজ বহুদিন হইল কিছু অর্থ সংগ্রহের আশায় ভারতে আসিয়াছেন। সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিলেও তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র উইলিয়মের কোনও প্রকার সংবাদ লইতেন না।

উইলিয়মের মাতা লেডী সেমেরা সেই সুদূর আয়র্লণ্ডে ডাবলিনের কাছে মটলী-ভ্যালী গ্রামে তাঁহার জমিদার শ্বশুর-বাড়ীতে একাকিনী পুত্রটীকে লইয়া থাকিতেন। মাসে মাসে মর্ণো তাঁহার স্ত্রীর নিকট পত্র লিখিতেন। তাহাতে প্রথমেই লেখা থাকিত—"প্রিয় সেমেরা! তুমি আসিবে কি না জানি না। যদি আস তবে আগামী ডিসেম্বর মাসে আসিও। আমি তোমার জন্য বড় ব্যস্ত আছি।"

লেডী সেমেরা তাঁহার স্বামীকে যে বিশেষ ভক্তি করিতেন না বা ভালবাসিতেন না, প্রাণের খবর যিনি লইতে পারেন তাঁহার কাছে ইহা ছাপা থাকিত না।

অনেক সময় বড় বড় দার্শনিকেরও ভুল হয়। আমাদের এ সন্দেহ নিতান্ত সত্য নাও হইতে পারে। সেমেরা হয়ত অন্য কোন কারণে ভারতবর্ষে আসেন নাই।

তাঁহার ভারতবর্ষে না আসিবার আর একটা কারণ ছিল। তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। লেডী সেমেরার মাতা বহুদিন হইতে পীড়িতা ছিলেন। তাঁহার দুইটী কন্যা ছাড়া এ সংসারে বিশেষ ঘনিষ্ঠ আর কোন আত্মীয় ছিল না। বৃদ্ধা অনেকবার কন্যাকে ভারতবর্ষে তাঁহার জামাতার কাছে যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যা তাহা শুনেন নাই। লেডী সেমেরার শ্বশুর-বাড়ী বাপের বাড়ী হইতে বড় বেশী দূরে ছিল না। সুতরাং শ্বশুর-বাড়ী হইতেই তিনি অনায়াসে পীড়িতা মাতার সংবাদ লইতে পারিতেন।

দুঃখের কথা শ্বশুর-বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার বিশেষ সুখ ছিল না। অনবরত তাঁহাকে নানা নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত। বিশেষতঃ তাঁহার শাশুড়ী বাঁচিয়াছিলেন না। সম্পত্তির সরিকও অনেক ছিল। আট বছরের উইলিয়মকে লইয়া স্বামী ছাড়িয়া তিনি নিঃসঙ্গজীবন অতিবাহিত করিতেন।

একদিন শুনিলেন তাঁহার মায়ের বড় অসুখ। কাহাকেও কিছু না বলিয়া পুত্রটীকে বুকে লইয়া তিনি শ্বশুর-বাড়ী মটলা-ভ্যালী ছাড়িয়া তাঁহার পিত্রালয় এডেন-ভ্যালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুত্রটীকে লইয়া নির্জ্জন মাঠের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তাঁহার আঁখি দিয়া জল পড়িতেছিল। মায়ের সেই স্নেহভরা মুখখানি, সেই অকৃত্রিম ভাল-বাসা মনে আসিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া তুলিল। তিনি প্রাণের শোক চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। উইলিয়ম তাঁহার মায়ের

আঁখি দিয়া জল পড়িতে দেখিয়া মুখখানি মুছাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছিল। লেডী সেমেরা নিঃশব্দে বহিঃপ্রাচীর পার হইয়া তাঁহাদের নীলধবল বাড়ীখানিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

অকস্মাৎ স্নেহের কন্যাকে দেখিয়া মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মাতা কন্যায় কথা আরম্ভ হইল।

মা বলিলেন,—মা, জোর করিয়া তোমার আসা ভাল হয় নাই। তোমার পিতা মরিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তোমার চাচা ত আছেন। তুমি কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া এমন ভাবে চলিয়া আসিলে, ইহা বোধ হয় ভাল হয় নাই। ফ্লোরা তো নিতান্ত ছোট মেয়ে নয়, আমার দেখা শুনার কাজ তাহার দ্বারাই তো চলিতেছিল।

সেমেরা বলিলেন—আমি থাকিতে পারি নাই, তাই আসিয়াছি। ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা চিন্তা করিয়া দেখি নাই। আপনার শরীর যেরূপ দুর্ব্বল তাহাতে সর্ব্বদাই ভয় হয়—কোন্ সময় আপনাকে হারাইয়া ফেলি। সেমেরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অদ্ধোচ্চারিত বেদনামাখা স্বরে কহিলেন,—মা, আপনি মরিয়া যাইবেন। আমি কেমন করিয়া সে মৃতদেহ দেখিব!

মা বলিলেন,—মা, এ সংসারে এক দিন আমিও মায়ের কোলে শিশু হইয়া আসিয়াছিলাম। অভিনয় শেষ করিয়া চলিয়া যাইব। ইহাতে চিন্তা কি?

তোমার কাছেও অভিনয়ের আহ্বান আসিয়াছে। আজ তুমি যুবতী। কল্য তুমি দাস-দাসী ও সন্তান সন্ততি পরিবৃতা হইয়া কঠিন কর্ত্তব্যভার

মাথায় লইয়া চিন্তা-ক্লিষ্টা গৃহিণী হইবে। মা, ইহাই সংসারের নিয়ম—হৃদয় যেন অপবিত্র না হয়। ভগবানকে ভয় করিও। সর্ব্বদা সয়তানের সহিত সংগ্রাম করিবে—উহাই যথার্থ ধর্ম্ম। স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিও। মরিবার সময় কষ্ট হইবে না।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

——:*:——

[মিঃ মর্ণোর বাড়ী—দুইটী বালিকার মধ্যে কথা হইতেছে—একজন সরলা। অন্যটী মিঃ মর্ণোর শ্যালিকা, নাম—ফ্লোরা। সরলা—বাঙ্গালী খ্রীষ্টান। মর্ণো তাহাকে মিস্ সিরেল বলিয়া ডাকেন। সরলা যে বাঙ্গালী এ কথা তিনি একেবারে গোপন করিয়া ফেলিয়াছেন।]

সরলা কহিল—তুমি আমার বন্ধু। অনেকবার আমায় অনুরোধ করিয়াছ। বন্ধুরূপে সকল কথাই তোমাকে বলিব। যে কথা তোমার দিদির কাছে বলিতে সঙ্কুচিত হই, যাহা তোমার দাদার কাছে বলিতে লজ্জা হয়, তাহা তোমার কাছে আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি। আমার নাম যে মিস্ সিরেল নয়, তা তুমি বেশ জান।

যশোর জেলার অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামে আমাদের বাড়ী। আমার বয়স তখন পঁচিশ। ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে তাহা তুমি জান না বোধ হয়। হিন্দু জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণশ্রেণী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

কতবার তুমি কত ভালবাসার কথা বলিয়া আমার জীবনকথা শুনিতে চাহিয়াছ। কিন্তু, আমি বলি নাই। কেন বলি নাই, তাহা তুমি হয়ত বুঝিতে চেষ্টা কর নাই। উহা বলিতে আমার প্রাণ চূর্ণ হইয়া যায়। হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ভাসিয়া উঠে। কিন্তু সখি! তোমার অকৃত্রিম ভালবাসার সম্মুখে আমার সে ব্যথা দাঁড়াইতে পারিবে না। তুমি উচ্চবংশসম্ভূতা, আমিও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।

বহুকাল হইতে আমাদের নিয়ম—সামান্য ঘরে কন্যা বিবাহ দিলে বংশ-মর্য্যাদা থাকে না। পিতৃষসা অষ্টাশীতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিয়া যমকে স্বামী রূপে গ্রহণ করেন। পিতা, পঞ্চবিংশতি কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন।

ফ্লোরা শিহরিয়া উঠিল!

সরলা আবার কহিতে আরম্ভ করিলেন—

আমি বাল্যকালে অত্যন্ত ধার্ম্মিকা ছিলাম। কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। পতঙ্গ দলিত করিতেও ভীতা হইতাম। কখনও মৎস্য-মাংস স্পর্শ করিতাম না। তোমাদের যেমন বাইবেল, আমাদেরও তেমনি গীতা ও বেদ; আমি উহা অত্যন্ত ভক্তির সহিত পাঠ করিতাম। নিত্য দেবতার সম্মুখে ফুল দিতাম। কিন্তু কখনও স্বামিলাভাশায় দেবতাকে পূজা করি নাই। তখন আমার বয়স পঁচিশ। বিবাহের কোন আশা ছিল না। হৃদয় পবিত্র রাখিবার জন্য দিবারাত্র উপাসনা করিতাম। সহসা একদিন বসন্তকালের প্রভাতে এক অতি মিষ্ট শব্দ শুনিতে পাইলাম। সেই মধুর শব্দ আমার কর্ণকুহর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিল। উহা ঠিক শব্দ নয়, এক অপূর্ব্ব ভাবময় উন্মাদক রাগিণী। উহা যেন কোন অনন্ত হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল। শূন্য আকাশ ও বৃক্ষগুলি কাঁপাইয়া আমার প্রাণের অতি নিভৃত গুহাও কাঁপাইয়া গেল। সেই সময়কার অবস্থার কথা ভাবিলে আমার শরীর শিহরিয়া উঠে।

সেই কুহুতান আমাকে অবশ করিয়া ফেলিল। আমি চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িলাম। দ্বিপ্রহর বেলা—দেখিলাম আমি মেজেয় পড়িয়া আছি। আমার মা আমার কাছে বসিয়া। পিতা মাতার কাছে সব কথা বলা

যায় ফোয়ারা; কিন্তু যে বেদনায় প্রাণ চূর্ণ হয়, সে ব্যথার কথা তাঁহাদিগকে বলা নাকি অত্যন্ত লজ্জাজনক।

সেই কুহুতান - আবার সেই কুহুতান! অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত আবার সেই স্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সীমাহীন হাহাকার ও যাতনায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল—কি যেন আমার নাই। কি যেন আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, সরলা! কিছু খাবি? আমি কহিলাম, কিছু না।

ক্ষুধা থাকিলেও পেট আমার ভরিয়া ছিল। কোন্ অজানা অনির্দ্দিষ্ট দেশে আমার কোন এক প্রাণের সখা তাঁহার মোহন হস্তে অমৃতথালা লইয়া পথে আমারই আশায় দাঁড়াইয়া আছেন, আমি তাঁহারই ভিখারী। সেই অমৃত আমার ক্ষুধা নিবারণ করিতে সক্ষম, অন্য কিছু নহে; ইহাই আমার মনে স্পষ্ট ভাবে ভাসিয়া উঠিল।

অনেক স্নেহের অনুনয়ের পর অল্প পরিমাণে দুধ পান করিলাম। একটু বল সংগ্রহ করিয়া বিছানা হইতে উঠিলাম এবং কালবিলম্ব না করিয়া স্নান শেষ করিয়া গীতা লইয়া দেবতার নাম করিতে করিতে দেবতার ঘরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে কেবল দেবতাকে ডাকিতে লাগিলাম।

ছয়মাস কাটিয়া গেল। প্রাণে অব্যক্ত যাতনা। কেবল দিবারাত্র 'হরি, হরি' করি। গ্রামময় রাষ্ট্র হইল—আমি এক নূতন সন্ন্যাসিনী।

কেহ কেহ বলিলেন, আমি স্বয়ং কালী। কালী হইতে পারি, কিন্তু আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, আকাশে বাতাসে, তারায় চন্দ্রালোকে, দেবতার মুখে, গীতায়, ফুলের হাসিতে, পাপিয়ার উচ্চতানে আমার অজানা শিবের মূর্ত্তি আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম।

সরলা

দুপুর বেলায় উদাস বাতাস—আমার হৃদয়ের দ্বারে আমার নারায়ণের প্রণয় লিপি ফেলিয়া যাইত। কেহ কেহ আমাকে ইদানীং মহাশক্তিরূপে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! নিশীথে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত উদার গম্ভীর নৈশ প্রকৃতির ভিতর দিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার অজানা কৃষ্ণ! শ্রবণে শব্দহীন রাগিণী ঢালিতে ঢালিতে শূন্যপথ দিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন।

হায় হায় সে মর্ম্মযন্ত্রণার কথা কি প্রকারে কহিব?

ক্রমে আমি এক বিখ্যাত সন্ন্যাসিনী হইয়া পড়িলাম। আমার ঘুম নাই, নিদ্রা নাই, আহার নাই—আমি মা মহাশক্তি জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য অবতাররূপে পিতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। হরি! হরি! এই কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। আমি শিহরিয়া উঠিতাম। ইহা নাকি আমাদের কৌলীন্যের প্রতিদান।

এক বৎসর অতীত হইয়া গেল; কাহারও সহিত কথা কহি না, কেবল গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকি। শুকাইয়া অস্থিপঞ্জরে পরিণত হইলাম। এই সময় এক অষ্টাদশবর্ষীয় কায়স্থ যুবক কোথা হইতে আমাদের বাড়ীতে আসিল।

প্রথম দৃষ্টিতেই অন্তর আমার কাঁপিয়া উঠিল। আমি মূর্চ্ছিতা হইতেছিলাম, অতিকষ্টে সংবরণ করিলাম। সে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি পিতামাতা, ভগ্নী, বন্ধু, সকল কথা ভুলিয়া তাহার দিকে কতক্ষণ তাকাইয়া ছিলাম জানি না! সে যখন 'মা' বলিয়া আমার চরণ চুম্বন করিল তখন আমার চমক ভাঙ্গিল।

হরি! হরি! নারায়ণ নারায়ণীকে মা বলিয়া সম্বোধন করে ইহা তো কখনো শুনি নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—○0○—

বলিতে কি, সেই অষ্টাদশ বৎসরের যুবক আমার সমস্ত ধ্যান, সমস্ত জ্ঞান, চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিল। প্রথমে জানিতে পারি নাই, সে কে? পরে জানিলাম সে আমাদের এক যজমান-পুত্র। তাহার পিতা মাতা তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া সম্পূর্ণ নিঃসহায় অবস্থায় পৃথিবীর পথে রাখিয়া গিয়াছিল। আমার পিতা দয়া করিয়া তাহাকে বাড়ীতে স্থান দিয়াছেন।

আমার প্রাণের সমস্ত মমতা তাহার উপর ঢলিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু সে আমায় 'মা' বলিয়া ডাকে! বলি কাহারও স্ত্রী না হইয়া মাতার মহিমায় কি প্রকারে অভিষিক্তা হইলাম।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। আমারও তাহার প্রতি আসক্তি বাড়িয়া যাইতেছিল। কেহ আমাকে সন্দেহ করিত না। কি বিস্ময়! সে হতভাগাও কিছু বুঝিতে পারিত না। তাহাতে আমার আরও কষ্ট হইতেছিল। আমার আসক্তি তখন যদি কেহ অপবিত্র মনে করিত তবে সে নিতান্তই ভুল করিত। আমি তাহাকে কেবল রাজার সাজে মহাঋষির বেশে প্রাণের সিংহাসনে বসাইতেছিলাম। তাহার বক্ষঃখানির স্পর্শ পাইবার জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া ছুটিতেছিল। তবুও বলি, যদি কেহ আমাকে তখনও কোন প্রকার পাপ ধারণার জন্য দোষী করিত তবে সে বড়ই ভুল করিত। তাহার ওষ্ঠস্পর্শটুকু পাইবার জন্য আমার

প্রাণ সারা দিনরাত, সারা নিশি কাঁদিয়া মরিত। তবুও বলি, আমি তখনও নির্দোষ।

দেবতার সম্মুখে যাইয়া বসিতাম, সেই বালকের মুখ আমার অন্তর-আকাশে ভাসিয়া উঠিত। আমি নিজ হস্তে তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতাম। তাহার বিছানা পাতিয়া দিতাম। কেহ কিছু মনে করিত না। কিন্তু কি আগুনে পুড়িয়া মরিতেছিলাম, তাহা কেবল ভগবান্ জানিতেন। ইচ্ছা হইত তাহার বক্ষে বক্ষঃ রাখিয়া অনন্ত কাল ঘুমাইয়া থাকি। শপথ করিয়া বলিতে পারি, আর কোনও প্রকার ধারণা আমার প্রাণে তখনও আসে নাই। আমি ইচ্ছা করিতাম সে জানুক —আমি তাহাকে ভালবাসি! তাহাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না। আরো ত সহস্র পুরুষ ছিল। কাহারো জন্য এমন করিয়া পাগল হই নাই। আর পাগল হইবার উপায়ও ছিল না। সেই কুহুস্বর শুনিবার পর আমার চোখের সম্মুখে এক সুন্দর নূতন পৃথিবী ভাসিয়া উঠিল। তখনও প্রেমের ভালবাসার কিছু বুঝি নাই,—শুধু একটা পুরুষের জন্য প্রাণ আমার ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। সে ধরণীর কোন পথ দিয়ে আমার সম্মুখে আজ ভাসিয়া উঠিল। আমি স্বর্গ হাতে পাইলাম। দিন দিন তাহাকে অতি সুন্দর দেখিতে লাগিলাম। অন্য লোকেরা তাহার কুৎসিৎ মূর্ত্তির জন্য উপহাস করিত। আমি তাহার কুৎসিৎ মূর্ত্তিই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-বিচ্ছুরিত দেখিতাম।

অনেক মাস এই ভাবে কাটিয়া গেল। একদা বসন্তকালে চন্দ্রা-লোকের স্বর্ণচ্ছটায় সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত। বাতাস আকুল হইয়া আমার চুল লইয়া খেলা করিতে ছিল। আমি আকাশের দিকে চাহিয়াছিলাম।

ক্রমে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমি জাগিয়া ছিলাম ; আমার বড় ঘুম হইত না। ধীরে ধীরে রাত্রির নিস্তব্ধতা বাড়িয়া উঠিল। নিশীথের গাম্ভীর্য্য ও বাতাসের শন্ শন্ শব্দ আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। আমি শয্যা ছাড়িয়া উঠিলাম। ধীরে—অতি সন্তর্পণে শয্যা ছাড়িয়া দাঁড়াইলাম। আমার বক্ষঃ এক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভূতির ইচ্ছায় কাঁপিতে লাগিল। আমি বিলাসের শয়নকক্ষের দিকে চলিলাম। বিলাস সেই বালকের নাম।

বিলাসের বুকের একবারের স্পর্শ, তাহার ওষ্ঠের একটীমাত্র চুম্বন—আর কিছু না। হায়! তখন বুঝিতে পারি নাই একটা চুম্বনে সহস্র চুম্বনের বাসনা লুকানো আছে। বক্ষের স্পর্শের সহিত আরও অনেক কিছু মাখান জড়ান আছে।

ভগবান্ জানেন তখনও আমি পবিত্র। আমি শুধু একটা স্পর্শ চেয়েছিলাম আর কিছু নহে। ধীরে ধীরে তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। সে বিভোরে নিদ্রিত। হরি হরি! বিলাস কত সুন্দর। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য বিলাসের মাঝে। মনে হইল, সে এই মাত্র স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। আমি জগৎ সংসার ভুলিতে পারি,—ঈশ্বর চাই না, পুণ্য চাই না, শুধু বিলাসের বুকের একটু স্পর্শ চাই, তাহার ওষ্ঠের একটা চুম্বন।

আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নিদ্রিত বিলাসকে বাহুবদ্ধ করিলাম। সে চমকিত হইয়া চীৎকার করিতে যাইতেছিল। আমি তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলাম। চন্দ্রালোকে ঘর প্লাবিত—সে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল, সে অসাড়, নিস্পন্দ ও নির্ব্বাক্ হইয়া গেল।

আমি তাহাকে ব্যাকুল আগ্রহে বুকে তুলিয়া লইলাম। আমি অনির্ব্বচনীয় আবেগে তাহার ওষ্ঠের সহিত আমার ওষ্ঠ সংযোগ করিলাম।

সে কি অপরিসীম সুখ! সে কি স্বর্গীয় মহানন্দ! একটী বারের স্পর্শ! তাহাকে বুকে লইলাম, কিন্তু মুক্ত হইবার বাসনা হয় কই? একটি চুম্বন! কিন্তু কই ওষ্ঠ তো আর উঠাইতে ইচ্ছা হইল না। আমি অবশ ও চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম জানি না। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বুঝিলাম এমনই চৈতন্যহীন অবস্থায় প্রায় এক প্রহরকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

আমি আকুল আগ্রহে বিলাসকে আবার বুকে তুলিয়া লইলাম। তাহাকে বুকের ভিতর পিশিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছিল। তাহাকে সকল কথা ভুলিয়া সহস্রবার চুম্বন করিলাম। তাহাকে সহস্রবার বক্ষে স্থাপন করিলাম। কিন্তু বাসনার ত নিবৃত্তি হইল না! ইত্যবসরে আমরা বিবসন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

* * *

হায়! কি ভাবিয়াছিলাম কি হইল। দারুণ ঘৃণায়, লজ্জায় বিলাসকে হত্যা করিবার প্রতিজ্ঞা বুকে লইয়া বিলাসের ঘর পরিত্যাগ করিলাম। দিনের অস্পষ্ট আলোক তখন অন্ধ আঁধারের সংগত কোলাকুলি করিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

——:*:——

প্রত্যূষে আমার স্নান করিবার প্রথা ছিল। স্নান শেষ করিয়া সে দিন পূজায় না গিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে ফিরিয়া গেলাম।

দারুণ ব্যথায় হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু পাপের কথা ত একবারও ভাবি নাই, তবে কেমন করিয়া পাপ করিলাম। একটিবার চুম্বন করিতে গিয়া কেন সহস্রবার চুম্বন করিলাম, একটিবার স্পর্শসুখ অনুভব করিতে গিয়া কেন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম।

আমি না কাঁদিয়া থাকতে পারিলাম না। ভগবানের কাছে যুক্তকরে প্রার্থনা করিলাম—প্রভো! পিতঃ! সারা জীবন তোমার প্রার্থনা করিয়া কি এই ফল হইল? মুহূর্ত্তের ভুলে কি করিয়া ফেলিলাম! কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনেকক্ষণ কাটাইলাম, তার পর ঘুমাইয়া পড়িলাম। সহসা দরজায় আঘাত পড়িল। আমি চমকিয়া উঠিলাম, পাছে আমার মূর্ত্তিতে কোন কলঙ্কের দাগ ধরা পড়ে, তাই ভয়ে দিদিকে কহিলাম—আমি খাইব না।

দিদি আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন—কোন কোন দিন না খাইয়াই উপাসনায় কাটাইয়া দিতাম। আমার জীবনে কোন কলঙ্ক সম্ভব, ইহা ভগবান্ ছাড়া কোন দেবতারও বিশ্বাস করিবার সাহস ছিল না।

যখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিল, আমি গৃহের বাহিরে আসিলাম। দিদি আমার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। খাইতে খাইতে কহিলাম—সান্ধ্য উপাসনার জন্য আর পূজার ঘরে যাইব না। প্রকৃত কথা, বহির্বাটীতে বিলাসের সম্মুখ দিয়া পূজার ঘরে যাইতে আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি গৃহে ফিরিয়া ধ্যানমগ্ন হইলাম। প্রভুর কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিলাম—'দয়াময়! তুমি আমায় পাপ হইতে রক্ষা কর। পাপ করিবার বাসনা কখনও ছিল না। যদি পাপের জন্য জীবন দিয়ে থাক, তবে সে জীবনে আমার কাজ নাই। আমায় মারিয়া ফেল!' ধীরে অনন্তের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম। পৃথিবীর সমস্ত চিন্তা ভুলিলাম। ধ্যানে অনন্তদুঃখী মানুষের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অনুভব করিলাম,—অনন্ত পুত্রের মা আমি। অতি পবিত্র ও মহান্। মহাকাশে আমার জন্য স্বর্ণসিংহাসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

ধ্যানে আরও অনুভূত হইল ত্রিশূলহস্তে উলঙ্গিনী শ্যামার বেশে শত দানবকে হত্যা করিতেছি। আমি যেন জগৎ-জননী মূর্ত্তিতে অনুপ্রাণিত হইলাম। কক্ষে আমার সুধার কলস। অনন্ত আর্ত্ত, ক্ষুধাতুর ও ব্যথিত আমার চতুর্দ্দিকে, আমি তাহাদগকে কোলে লইতেছি।

দেখিলাম আকাশ হইতে এক জ্যোতির ধারা আমার মস্তক ও কেশগুচ্ছকে এক অপূর্ব্ব আভাতে উদ্ভাসিত করিল। আমি সে স্বর্গীয় ধারার সম্মুখে প্রণত হইলাম।

কীটময় অন্তহীন নরক—সহস্র নরনারী লেলিহান আগুনের মাঝে আকুল আর্ত্তনাদে আকাশ কম্পিত করিতেছিল। কেন এরা পাপ করে? প্রাণ আমার কাঁদিয়া উঠিল।

তার পর দেখিলাম—লক্ষ কুসুমশোভিত অপূর্ব্ব এক উদ্যান।

পরীবালকেরা বৃক্ষে বৃক্ষে জল সেচন করিতেছিল। যুবক-যুবতীরা প্রেমালাপ করিতেছিল। মা বলিয়া তাহারা আমাকে প্রণাম করিল।

যখন ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল তখন রাত্রি এক প্রহর। আমার তখন অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল। দিদি ও বাবার সহিত যাইয়া আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিবার সময় বিলাসকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলাম। আমার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

* * *

আজিও চাঁদের আলোকে সমস্ত ভুবন ভরিয়া গিয়াছে। ক্রমে নিশীথ উপস্থিত হইল। আমার ঘুম নাই। আমি আকাশের পানে তাকাইয়া তার বিরাট্ শোভা এবং দূরে ধরণীর অমল ধবল রম্য বধূমূর্ত্তি দেখিতে-ছিলাম।

আমি একা এক ঘরে; সমস্ত জগৎ সুপ্ত। হঠাৎ চিন্তা আসিল—বিলাস কি করিতেছে?—কি বলিব, আমার নয়ন যেন মুদিয়া আসিতে লাগিল। আমার অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। এই কাছেই তো বিলাস—হাজার সৌন্দর্য্য নিয়ে একা একা সে পড়ে আছে! তার স্পর্শ কি মধুর! তার সিক্ত ওষ্ঠ দুখানি কি মদিরাময়! কি স্বর্গীয় সুখ তাতে মাখান! গা আমার এক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভূতির আশায় ঘন ঘন স্পন্দিত হতে লাগল। আমি স্থির থাকতে পারলাম না। নিঃশব্দে উন্মাদিনীর ন্যায় বিলাসের কক্ষপানে ছুটিলাম।

* * *

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। অনুতাপ, তপস্যা আর বিলাসের বিছানা জীবনকে স্বপ্ন করিয়া তুলিল।

এমন সময় এক রাত্রি স্বপ্নে দেখিলাম এক ঋষি স্বর্গ হইতে নামিয়া

আমার হস্ত স্পর্শ করিয়া কহিলেন—'জননি! ভয় করিও না। বিলাসকে ছাড়িয়া তোমার তপস্যা করিবার শক্তি নাই। যদি তাহা করিতে চাও, তোমার ধৃষ্টতায় ঈশ্বর পর্য্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন। তাহাকে ভালবাসিতে কোন সঙ্কোচ অনুভব করিও না। আমি মন্ত্র শিখাইয়া দিতেছি, উহা পাঠ করিয়া তুমি নিশীথে বিলাসকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিবে; তোমার পাপ হয় নাই। তোমার ভয় নাই। সাবধান তোমার ভালবাসা যেন অকৃত্রিম হয়।' বলিয়াই তিনি বাতাসে মিলাইয়া গেলেন। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন রাত্রির ত্রিযাম অতীত হইয়াছে।

কৌশল করিয়া বিলাসের শুইবার স্থান আমারই ঘরের পার্শ্বে সরাইয়া আনিয়াছিলাম। কেহই আমাকে সন্দেহ করিবার সাহস রাখিত না। স্বপ্ন দেখিবার পর আমি যেন নূতন জীবন পাইলাম। আনন্দে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল। বুঝিলাম, বিলাস আমার স্বামী—তাহাকে ফেলিয়া তপস্যা করিতে যাওয়া মূর্খতা ও পাপ।

পর দিন দেহখানি চন্দনচর্চ্চিত করিলাম। গীতা বক্ষে স্থাপন করিয়া দেবতার নাম লইলাম। পরম পিতা পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সহস্র নমস্কার করিলাম এবং যথাসময় নিঃশঙ্কচিত্তে স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিলাম। হৃদয় আজ এক কঠিন ভার হইতে মুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। এতদিন মানুষ অপেক্ষা বিবেকের কাছেই অধিক লজ্জিত ছিলাম। উপরতলায় মাত্র বিলাস একা, আর কেহ থাকিত না। সে আমার জন্য অপেক্ষা করিতে ছিল। আমি স্বামী বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম। প্রেমে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। কহিলাম—বিলাস, তুমি আমার স্বামী, ইহা সত্য কথা। তুমি ভীত হইও না। চন্দ্র, সূর্য্য যেমন সত্য—তুমি আমার স্বামী ইহাও তেমনি সত্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত পবিত্রতা, সমস্ত বিশ্বাস দিয়া আমি আজ নূতন করিয়া বিলাসকে চুম্বন করিলাম। সে আমাকে বুকে তুলিয়া লইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—— * ——

একদিন বুঝিলাম—আমি অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছি। আমার সকল সুখ এইখানেই থামিয়া গেল! সমাজ কি কহিবে—ভাবিয়া আকুল হইলাম। সমাজে মুখ দেখাইব কি করিয়া? বিলাসেরই বা স্থান হইবে কোথায়? এই দ্বিতীয় দুর্ঘটনার ফলে মানসিক অবস্থা কি প্রকার হইল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।

যে দিন প্রথম বুঝিলাম, তাহার পর প্রায় সাত দিন চলিয়া গেল। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

উপায় ছিল না। এতদিন ছিলাম এক সুখের জগতে ডুবিয়া। এখন ব্যথায় সমস্ত পৃথিবী আমার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিলাস কায়স্থ, আমি ব্রাহ্মণ। সে ছোট, আমি দেবতার অংশ। সমাজে আমাদের স্থান কোথায়? বিধাতা দেখেন এক চোখে—মানুষ দেখে আর এক চোখে। মানুষের চক্ষু হইতে কোথায় পালাইব? এই বালাই লুকাইবারও স্থান ছিল না। ইচ্ছা হইতেছে মাটীতে প্রবেশ করি। প্রাণের ব্যথা বিলাসকে তখনও বুঝিতে দেই নাই। অসুখের ভাণ করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ করিলাম। সারা রাত্রি অশ্রু বিসর্জ্জনে কাটিয়া যাইতে লাগিল। আর তার মুখখানির কথা যখনই মনে হইতেছিল তখনই শোকাবেগ উথলিয়া উঠিতেছিল, অতি কষ্টে কণ্ঠস্বর চাপিয়া রাখিলাম। মনে করিলাম—'বিষ খাইব।' কিন্তু বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করা যে মহাপাপ!

প্রতিদিন অল্প অল্প দুগ্ধ পান করিতাম মাত্র। বিলাস যখন আমাকে দেখিতে আসিত তখন আমি কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া রাখিতাম। ভয়, পাছে শোকাবেগ-সংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলি। অষ্টম দিবসে কিছু আহার করিলাম।

রাত্রি হইল। চিন্তামগ্ন হইয়া ভাবিলাম গৃহ ছাড়িয়া কোন স্থানে চলিয়া যাই! রমণীর নিরাপদ্ স্থান কোথায়?

তত্রাচ আমাকে গৃহ ছাড়িতে হইবে, নচেৎ কলঙ্কের সীমা থাকিবে না, স্থির হইল—বিলাসের নিকট হইতে শেষ বিদায় লইয়া আমাকে বাড়ী পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ক্রমে নিশীথ হইল। বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম। দুর্ব্বলতায় আমার পা কাঁপিতেছিল। সে মর্ম্মযাতনার কথা আমি আর ভগবান্ ছাড়া আর কেউ বুঝিতেছিলেন না।

ধীরে ধীরে বিলাসের প্রকোষ্ঠে যাইয়া তাহার গাত্রে হস্ত স্থাপন করিলাম। বিলাস চমকিত হইয়া উঠিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। আমি তাহাকে ধীরে নিরস্ত করিয়া কহিলাম—বিলাস! বিদায়ের সময় উপস্থিত। আমার সুখের দিন ফুরাইয়াছে। মুক্ত পৃথিবীই এখন আমার গৃহ।

বিলাস কাতর কণ্ঠে কহিল—কেন, প্রিয়তমে! এখন যে আমি তোমায় এক মুহূর্ত্তও না দেখিয়া থাকিতে পারি না।

সে এমন করিয়া ইহার পূর্ব্বে আর আমার সহিত কথা বলে নাই। সে এতকাল আমার ভালবাসার নীরব প্রতিদান দিয়াছে মাত্র। সে কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হইয়াছে প্রিয়তমে? আমি সকল কথা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। সে কহিল, 'আমি তোমাকে বাঁচাইব।

তোমার ব্যথার উপশমের জন্য আমার প্রাণ দিতে হয়—তাতেও আমি আহ্লাদের সহিত স্বীকৃত। চল উভয়েই এক সঙ্গে বাহির হইয়া যাই।"

আমি কহিলাম—সর্ব্বনাশ। তাহা হইলে আমার পিতামাতার কি হইবে বল দেখি? দেশময় কলঙ্কে তাঁহাদের জীবন বিষময় হয়ে উঠবে। তুমি থাক, আমি বাহির হইয়া যাই। ভগবান্ পাপীর বন্ধু, আশ্রয়হীনের আশ্রয়দাতা, বিপন্নের রক্ষাকর্ত্তা।

একার জন্য এতগুলি মানুষকে দুঃখ ও কলঙ্কের মধ্যে টানিয়া লইতে চাই না।

বিলাস কহিল—এস উভয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করি।

আমি কহিলাম—তাহাতে কলঙ্কের হাত হইতে মুক্তির আশা নাই। বরং ফল আরও গুরুতর হইবে।

বিলাসের আঁখি দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল। সে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল। কোথায় যাইব, কে আশ্রয় দিবে? পুরুষ স্বাধীন ভাবে আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া আপনার দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করিয়াও নিজকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। আর নারী সংসারের এক কোণায় মানুষের কৃপাকে সম্বল করিয়া পড়িয়া থাকে। তার কোথায়ও একটুখানি স্থান নাই।

* * *

আবার রাত্রি আসিল, এই আমার শেষ রাত্রি। যে গৃহখানি এতদিন আপন বলিয়া বুকে টানিয়া লইয়াছি, এখন তাহাকে চিরদিনের মত দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে। গাছ মাঠ, ঐ মাঠের মাঝে কতকালের পুরাণো বট বৃক্ষটা আমার জন্য একটা দীর্ঘ শ্বাসও ফেলিবে না। নির্ম্মম ঔদাস্যে সকলেই পড়িয়া থাকিবে। আমিই কেবল চলিয়া যাইব।

অনন্ত বিশ্বে কোথায় যাইয়া দাঁড়াইব? কে আমায় ডাকিয়া একটা

কথা কহিবে! দুদিন যদি অনাহারে থাকি, মানুষের পদাঘাত ছাড়া আমার ভাগ্যে কি জুটিবে! মেয়ে মানুষের জন্ম হয় কেন? কাব্যে, বইতে ও ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার মহিমা ও সুষমা ঘোষিত হইলেও আমাদের মত হীনা কে?

কোথায় যাইব? দেশের মধ্যে কোথায়ও স্থান হইবে না। ঠিক করিলাম কলিকাতায় যাই। শুনিয়াছিলাম কলিকাতা অতি ভীষণ স্থান। কলিকাতা পাপের লীলানিকেতন।

আমি অসতী নহি। আমার স্বামী বিলাস!

গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব, অস্ত্র দিয়া বুক চিরিয়া ফেলিব, তত্রাচ এ শরীর বিলাস ছাড়া অন্য কাহাকেও স্পর্শ করিতে দিব না।

কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য এক পত্র লিখিলাম। স্থির করিলাম উহা বিছানায় ফেলিয়া যাইব। উহাতে লিখিলাম—

"পাপময় সংসারে আর থাকিতে ইচ্ছা হয় না। ন্যায়ের নামে এখানে অন্যায় রাজত্ব করে। ভগবানের আরাধনা এ পাপ পৃথিবীতে হইবে না। আমাকে যেন কেহ না খুঁজে। স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া আমি হিমালয় পর্ব্বতে চলিলাম।"

যেখানে যাহা ছিল তেমনই করিয়া পড়িয়া থাকিল!

তখন রাত্রি একটা। একখানি ছিন্ন সাড়ী আর একখানা গায়ের কাপড় লইলাম।

সরলা ইংরাজীতে কথা কহিতেছিলেন। চাল চলনে একেবারে তিনি বিলাতী হইয়া গিয়াছিলেন। মিঃ মর্ণো সকলকেই কহিতেন সরলা তাঁহার স্ত্রীর সহোদরা। বর্ণ তাঁহার অত্যন্ত উজ্জ্বল, কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। মিস্ সিরেল নামে এখন তিনি পরিচিতা।

কেমন করিয়া এত পরিবর্ত্তন হইল, কেমন করিয়া তিনি মিঃ মর্ণোর গৃহে আসিয়াছেন তাহা পরে জানা যাইবে। কেমন করিয়া তিনি মিঃ মর্ণোর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। মর্ণো-জায়া কেন তাঁহাকে সহোদরার চক্ষে দেখেন, ফ্লোরার সহিত তাঁহার এত গভীর বন্ধুত্ব কেমন করিয়া হইল তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।

সরলা যে সব গোপন কথা বলিতেছেন ইহা অন্য কেহই জানেন না।

সরলার স্বভাব অতি সুন্দর। কলিকাতায় পাদরীর বাড়ীতে সরলা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, কেমন করিয়া মিঃ মর্ণোর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল তাহা সরলার কাহিনী শুনিতে শুনিতে জানা যাইবে।

সহানুভূতিতে ফ্লোরার চক্ষু এই সময় জলে ভরিয়া উঠিল।

সরলা কহিলেন—মিস্ ফ্লোরা, জগতে আমার আপনার বলিতে কেহই নাই।

তোমার সহানুভূতিতে আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আমার জন্য কেহ কাঁদে ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।

সরলা আবার তাঁহার কাহিনী কহিতে লাগিলেন—

"তখন রাত্রি একটা, আমি বিলাসের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বিলাস মোটেই ঘুমায় নাই। সে বসিয়া কাঁদিতেছিল। আমি তাহার কপোল চুম্বন করিয়া কহিলাম—বিলাস কাঁদিও না, আত্মা অবিনশ্বর; মানুষের ভয় করিবার কিছুই নাই। চল আব দেরী কেন? বাহির হইয়া পড়।"

অবিলম্বে আমরা মাঠের দিকে বাহির হইয়া পড়িলাম। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধতায় ভরিয়াছিল। আমরা নিঃশব্দে বড় রাস্তা পার হইয়া মাঠের ভিতর দিয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নীহার পড়িতেছিল। অস্পষ্ট তারার আলোকে আমরা উভয়ে উভয়ের মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম। বিলাস কাঁদিতেছিল; আমিও কাঁদিতেছিলাম।

আমরা নদীর ধারে শ্মশানের কাছে যাইয়া উপনীত হইলাম। উপরে মুক্ত নীলাকাশ, নিম্নে আপন মনে অনন্তের পানে নদীস্রোত ছুটিয়া চলিয়াছিল। বিরাট্ মাঠের মাঝে আমরা দুই জন। এ উহার মুখের পানে তাকাইয়া কেবলই কাঁদিতেছিলাম।

বেশীক্ষণ কাঁদিবার সময় ছিল না। রাত্রি প্রভাত হইবার যে কয়েক ঘণ্টা বাকী ছিল ইহার মধ্যে আমাকে বহুদূর যাইতে হইবে।

বিলাসের গায়ে আজ অসীম বল। আজ সত্যই স্বামীর মহিমায় অভিষিক্ত। বিলাস আমাকে অনায়াসে কোলে তুলিয়া লইল। আমি আপত্তি তুলিলাম না। এই শেষ, জীবনে আর কখনও দেখা হইবে না। অতীতের এই স্বপ্নটুকু সারাজীবন বুকের মাঝে জ্বলিতে থাকিবে।

বিলাস আমার চিবুকে হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—

'সরলা! কাঁদিও না। যদি বাঁচিয়া থাকি, নিশ্চয় আমি দুইমাস পরে তোমার সন্ধানে বাহির হইব। বিশ্বের আতিপাতি খুঁজিয়া তোমাকে বাহির করিব।

বিশ্ব না মানিলেও, ভগবান্ লইয়াছেন, তুমি আমার পত্নী। ঈশ্বরকে ভরসা করিয়া তোমাকে বিদায় দিতেছি।'

এই দুঃখের মধ্যে কত অজানা অন্তহীন ব্যথার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সুখে আনন্দে বিলাসের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া তাহার কথা শুনিতেছিলাম। কি সুখ কি আনন্দ!

যখন যথার্থ অবস্থা মনে হইল, শিহরিয়া আমি নাবিয়া পড়িলাম।

বিলাসের হস্তে সেই পত্রখানি দিলাম, বলিলাম ডাকে ফেলিয়া দিও। বিলাস আমার বাম হাতে একখানা কাগজ গুজিয়া দিয়া কহিল—এ দশখানি নোট তুমি লও। ইহাই আমার শেষ সম্বল।

ঈশ্বরের নাম করিয়া, বিলাসকে শেষ আলিঙ্গন দিয়া—তাহার হস্ত ও ললাটে শেষ চুম্বন মুদ্রিত করিয়া অনন্ত বিশ্বের পানে ছুটিয়া পড়িলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রায় ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছি, সম্মুখে সিঙ্গিয়ার রেল ষ্টেশন।

ধীরে ধীরে চুলগুলি কাটিয়া নদীজলে নিক্ষেপ করিলাম। বিলাসের সম্মুখে উহা করিতে সাহস করি নাই। আমার বিশ্বাস, সে এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিত না।

ভগবানকে ডাকিতেছিলাম। ধীরে উষার আলো দেখা দিল। সে স্বর্গীয় দৃশ্যের মধ্যে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে বিপুল শক্তি লাভ করিলাম।

ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—কিসের ভয়? তুমি মানুষ, তোমার ভিতর আত্মা আছে। কামানের গোলা উহাকে জয় করিতে পারে না, বজ্রকে সে উপহাস করে; হরি হরি! মানুষ এমন মাণিকের মালিক হইয়াও ভয় করিবে? সে মহারাজা, তাহার আবার কিসের ভয়!

অবিলম্বে সিঙ্গিয়া পৌঁছিলাম: জলাশয় হইতে পা ধুইয়া আসিয়াছিলাম। ষ্টেশনের এক প্রান্তে কম্বল পাতিয়া বসিলাম এবং ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম।

ভয় দূর হইয়া গেল। মাতার মহিমা যেন আমার মধ্যে ভাসিয়া উঠিল।

একটি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাবা! কলিকাতার ট্রেন

আসিবার দেরী কত ?' তিনি অত্যন্ত মধুর ভাষায় কহিলেন—'আপনি কোথায় যাবেন ?'

আমি কহিলাম—'কলিকাতায় ।'

যুবক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার সঙ্গে আর কে আছেন ?' আমি কহিলাম—'কেউ না ।'

যুবক একটু চিন্তিত হইয়া কহিলেন—'আচ্ছা, আপনি অপেক্ষা করুন। আমি আপনার সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিব ।'

যুবক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কোথা থেকে আসছেন ?'

ভিতরে ভিতরে একটু চাপা বেদনা ছিল। একটু নম্র স্বরে কহিলাম—'বাবা, আমার বাড়ী বৰ্দ্ধমান। আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। যশোরে এসেছিলাম।' যুবক যেন বুঝিতে পারিলেন—আমি বিপন্না। যশোরের নাম শুনিয়া একটু আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিলেন—'আপনি যশোরে কেন এসেছিলেন ? আমার বাড়ীও যশোরে, নড়াইল মহকুমায় ।'

মিথ্যা কথা বলা ছাড়া উপায় ছিল না—অথচ জীবনে কখনো মিথ্যা বলি নাই। ভগবানকে স্মরণ করিয়া, বুকে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কহিলাম—'বাবা! আমি বড় দুঃখিনী। এ সংসারে স্বামী ছাড়া আর আমার কেউ ছিলেন না। স্বামী এই কাছেই এক জমিদারের বাড়ী কাজ করিতেন, এ পথে একবার আমি এসেছিলাম। কয়েক দিন আগে সংবাদ পেয়েছিলাম তাঁহার ভয়ানক জ্বরবিকার। সংবাদ পেয়ে ছুটে এসে তাঁকে চিরকালের জন্য ফেলে যেতে হলো। তিনি শুক্রবারে মারা গেছেন।

অনেক টাকার ঋণী তিনি ছিলেন। বাড়ী ফিরিবার উপায় নাই। জমিদারদের প্রাণে একটু মায়াও নাই। তাদের অত্যাচার ও অপমান

সহ্য করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কলিকাতায় যাচ্ছি, যদি বড়লোকদের বাড়ীতে একটা চাকরী পাই।'

যুবক অনেকক্ষণ কি যেন ভাবিলেন। তাঁহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। আমার দীনহৃদয়ের কৃতজ্ঞতা শতধারে তাঁহার পানে ছুটিয়া যাইতেছিল। যুবক, জ্ঞানীর মত জুয়াচুরির সন্দেহ করিয়া চলিয়া গেলেন না। তিনি আমার মিথ্যা কথাকেই সত্য জানিয়া—নিজকে মহিমায় ভরিয়া ফেলিলেন।

যুবক অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া কি যেন চিন্তা করিলেন। দেখিলাম তাঁহার দৃষ্টি অত্যন্ত বেদনাব্যঞ্জক। বিশ্বকে সহানুভূতি জানাইবার জন্যই যেন সে দৃষ্টি কত কাতর! তাঁহার চাহনীতে ব্যথার নির্ঝর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

যুবক কহিলেন—'আপনার কোন ভয় নাই।' তাঁহার সহানুভূতিতে আমার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম তিনি মুসলমান। তাঁহাকে ইচ্ছা হইল ভাই বলিয়া ডাকি। ভাবিলাম—মুসলমান কি আমার পর। সে ত সত্য সত্যই আমার ভাই!

কৃতজ্ঞতায় মুখে কথা বাধিয়া আসিতেছিল। আমি তাঁহাকে অধিক ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিলাম। তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। বলিলেন—'আপনি এখানে বসুন, আমি ঘুরিয়া আসিতেছি। আমার কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, আমি আপনার দেশের লোক।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যুবক ঘুরিয়া আসিয়া কহিলেন—'আমার এক সহপাঠী বন্ধু আছেন। তিনি ব্রাহ্মণ। তাঁহার সহিত আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব। ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট টেলিগ্রাম করিলাম।'

গাড়ী আসিবার বেশী বিলম্ব ছিল না। টিকিটের জন্য একখানা নোট তাঁহার হাতে প্রদান করিতে গেলাম। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না।

অতঃপর ইণ্টার ক্লাসের দুইখানি টিকট আনিয়া একখানা আমাকে দিলেন, একখানা নিজে রাখিলেন। কৃতজ্ঞতায় আমার মুখে কথা সরিতে-ছিল না। তিনি যেন তাহাতে লজ্জিত হইয়া কহিলেন—'আপনি কোন প্রকার সঙ্কোচ অনুভব করিবেন না।'

শীঘ্রই গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে থামিল। তিনি আমাকে মেয়ে-গাড়ীতে খুব সতর্কতার সহিত থাকিতে বলিলেন। আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম।

গাড়ী কলিকাতায় পেঁৗছিলে তিনি আসিয়া আমাকে নাবাইয়া লইবেন, তাহাও বলিয়া গেলেন।

ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া বসিয়া রহিলাম। কতকগুলি মিথ্যা কথা বলিয়াছি, সেগুলি বেশ করিয়া মনে রাখিলাম; কারণ, কথায় ও কাজে যদি কোন অসামঞ্জস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বড় বিপদের কারণ হইতে পারে। বুকে বল সংগ্রহের জন্য ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গাড়ীর মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহারা কেহ স্বামীর ভালবাসার কথা, কেহ বাগ্‌বাজারের রসগোল্লার কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের চোখে মুখে কত আনন্দ।

কত শিশু, কত বালক বালিকা—তাহাদের আনন্দ উল্লাস দিয়া গাড়ীর গম্ভীর ও ভীষণ গর্জ্জন পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিতেছিল।

একটি শিশু বালিকা তাহার মাতার দুগ্ধ পান করিতেছিল। ভাবিলাম, এই শিশুটি কে জানে এর ভবিষ্যতে কি হইবে? এক দিন আমিও এর মত ছিলাম। আমার মা আমাকে কত আদরে সোহাগে বুকের ভিতর টানিয়া লইতেন। আজ আমি কোথায়! তিনি কি একবারও ভাবিয়াছিলেন এমন করিয়া ভিখারিণী সাজিয়া এক সময়ে আমাকে সংসার হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে।

বাহিরে অন্তহীন মাঠ। ইঞ্জিন রাক্ষসী জননীর মহিমাময়—সেই নৈশ প্রকৃতির বুকে পদাঘাত করিতে করিতে, উদার মহাশূন্যকে শাসাইতে শাসাইতে সহস্র সন্তান বুকে লইয়া—আপন পথে ছুটিতেছিল।

রাত্রি যখন তিনটা তখন যুবক একবার আমার সংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিলাম।

তিনি চলিয়া গেলেন।

শেষ রাত্রিতে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। যাহার এমন করিয়া কপাল পুড়িয়া গেল, তাহার চোখে আবার ঘুম! চমকিত হইয়া ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। মন এমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল যে, ঘুমাইতেও ভীত হইতেছিলাম।

* * *

যখন প্রভাত তখন গাড়ী কলিকাতায় যাইয়া পৌছিল। কি আশ্চর্য্য! পিতাস্তই আত্মীয়ের মত সেই যুবক আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমিও অজ্ঞাতসারে সহোদরার মত তাঁহার উপর নির্ভরশীলা হইয়া পড়িলাম।

যুবক কহিলেন—"নরেন যদি আসিয়া থাকে তবে সকল দিক্ই রক্ষা, না আসিলে আপনাকে লইয়া তাহাদের বাড়াতে যাইব।"

ভিড় কমিবার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

ধীরে ধীরে ভিড় কমিয়া গেল। আমরা প্লাটফর্ম ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম। কত লোক দেখিলাম, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ যুবক আমাদের নিকট আসিলেন না।

যুবক একটু চিন্তিত হইবার পর বলিলেন—'আচ্ছা, চিন্তার কোন কারণ নাই। নরেন আমার অকৃত্রিম বন্ধু। হয় ত সে পীড়িত, না হয় অন্য কোন কারণে সে আসিতে পারে নাই। গাড়ী করিয়া আমরা সেখানে যাইব। আপনার কোন চিন্তা নাই।"

কৃতজ্ঞতায় ও সঙ্কোচে আমার পা উঠিতেছিল না। কথা কহিতে পারিলাম না—চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিলম্ব না করিয়া একখানা গাড়ী ভাড়া লইয়া আমরা ধর্ম্মতলার দিকে চলিলাম। যুবকের দৃষ্টি আনন্দময়, পাছে আমার মন খারাপ হয় এই ভাবিয়া হয়ত তিনি বেশী করিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন।

এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ী ধর্ম্মতলার মোড়ের কাছে এক প্রকাণ্ড বাড়ীর গেটের ভিতর ঢুকিয়া গেল। 'নরেন'—সঙ্গী যুবক নামিয়াই 'নরেন' বলিয়া চাৎকার আরম্ভ করিলেন।

বহু ডাকাডাকির পর নরেন শুষ্ক হাসি ওষ্ঠে মাখিয়া—নীচে নামিলেন।

তত্রাচ আমার সঙ্গী প্রেমপূর্ণ প্রাণে সরল প্রশান্ত বিশ্বাসে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

আমার সন্দেহ হইতেছিল। যুবক যাঁহার বন্ধুত্বের এত বড়াই করিলেন তাঁহার ব্যবহার ওরূপ হওয়া ঠিক নহে! আমি গাড়ীর ভিতর বসিয়াছিলাম।

কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর যুবক প্রশ্ন করিলেন—"ছুটিতে তোমার কেমন পড়া হয়েছে নরেন?"

নরেন বাবু সে কথায় উত্তর না দিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে মেয়েটী কই?"

যুবক আমার দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিলেন। আমি নামিয়া পড়িলাম। তিনি কহিলেন—"এটা আপনার নিজের বাড়ী মনে করিবেন। এখানে আর দাঁড়ান দরকার কি? বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করুন। নরেনকে সব কথা টেলিগ্রামে জানাইয়াছি।"

ভিতরে প্রবেশ করা উচিত কি অনুচিত তাহা চিন্তা করিলাম না। যুবকের আজ্ঞা পালনের জন্যই নরেন বাবুদের অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হইলাম। এমন সময় নরেন বাবু বাধা দিয়া কহিলেন—"আহামদ, তুমি কি একটা অন্য ব্যবস্থা করিতে পারিলে না?"

বুঝিলাম যুবকের নাম আহামদ।

আহামদ কেমন হইয়া গেলেন। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। "আচ্ছা" বলিয়া তিনি পুনরায় আমাকে গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন। অতঃপর কোচোয়ানকে কহিলেন—"হাঁকাও ২০৪ নং ধর্ম্মতলা।"

অবিলম্বে আমরা এক মেসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বেলা তখন দশটা। গেটের সম্মুখে তিনি আমাকে নামিয়া পড়িতে বলিয়া কোচোয়ানকে দাম পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

দারোয়ান রাস্তা ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার চাহনি দেখিয়া বুঝিলাম সে যেন বড় বিস্মিত হইয়াছে। মনে মনে বোধ হয় চিন্তা করিতেছিল—বাবুর সহিত মেসের মধ্যে মেয়ে মানুষ কেন?

আহাম্মদ নীচের তলায় থাকিতেন। তাহার সাংসারিক অবস্থা যে বিশেষ ভাল ছিল না তাহা আমি বুঝিতেছিলাম। তিনি বন্ধুদের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টির ভিতর দিয়া নিজের কামরায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রকোষ্ঠে বিশেষ সাজ সজ্জা ছিল না। একখানি চৌকি এবং চৌকির নিম্নে নর-কঙ্কাল। সেই কামরায় আর একটি যুবক ছিলেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

আহামদকে দেখিয়া এই যুবক বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আমার পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করিলেন। আহাম্মদকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম তিনি অবিকল তাহাই পুনরায় এই যুবকের কাছে বলিলেন। তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমার জন্য প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার প্রভায় মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

অতঃপর স্নান শেষ করিলাম। আহামদ সকল প্রকারে আমাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কলিকাতার মিষ্টান্ন আমি খাইলাম না। আহামদ দোকান হইতে কিছু চিড়া ও দুগ্ধ ক্রয় করিয়া আনিলেন।

যে যুবকটী কামরা ছাড়িয়া গেলেন তাঁহার নাম মুহিত। মুহিতের কথা ও ব্যবহার কত সুন্দর! বৈকালে আমাকে মুহিতের কাছে রাখিয়া তিনি একটা পিত্তলের হাঁড়ী, একটা কটাহ, একটা কয়লার চুল্লী এবং কিছু আতপ চাউল ক্রয় করিয়া আনিলেন।

রাত্রিবেলা একাকী সেই প্রকোষ্ঠে থাকিলাম। এইরূপে চারি পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। কতকগুলি ছেলে সেখানে ছিল, তাহারা লুকাইয়া লুকাইয়া আমাকে দেখিতে আরম্ভ করিল। তাহারা শুনাইয়া শুনাইয়া অশ্লীল কথা উচ্চারণ করিতেও ছাড়িত না। তাহাদের উপর আমার অত্যন্ত ঘৃণা হইত, এবং সে জন্য যত শীঘ্র পারি স্থান পরিবর্ত্তন নিমিত্ত বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম।

প্রত্যহ আহামদ আমার চাকরীর অন্বেষণে বাহির হইতেন, এবং প্রতি সন্ধ্যায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। এত বড় একটা প্রকাণ্ড সহর, ইহার মধ্যে একটা সামান্য দাসীবৃত্তি মিলিবে না, ইহার অর্থ কি? আমি তো কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে।

প্রথম প্রথম তাঁহাকে বিশেষ চিন্তিত দেখিতাম না। ব্যর্থতায় তাঁহাকে ম্রিয়মাণ করিতে পারিত না। পর পর কয়েকদিন অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি যেন একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই পুরুষের মেসে একটা অপরিচিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে আর কয় দিন থাকা চলে? বিশেষ করিয়া স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল না।

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—ভাই, আপনাকে চিন্তিত দেখিতেছি। আমার জন্য একটা কাজও কি জুটিল না?

তিনি হাসিয়া বলিলেন—সে জন্য ব্যস্ত হইও না সরলা, তুমি হিন্দু বলিয়া হিন্দুর চক্ষে তোমাকে দেখি না। আশ্রিতকে আশ্রয় দেওয়া মুসলমানের শ্রেষ্ঠ কাজ। তোমাকে আমি অনুগ্রহ দেখাইতেছি না। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছি মাত্র। তুমি আমাকে সহোদর রূপে গ্রহণ করিও।

কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, আহামদ আরও চিন্তিত

হইয়া পড়িলেন। চেষ্টা করিয়াও তাঁহার চিন্তা ঢাকিবার ক্ষমতা রহিল না।

আমি আর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ভাই, এখানে আর ক'দিন থাকা যায় ?

তিনি বলিলেন—ছোট ভগ্নীর মত চুপ করিয়া থাক। ভাই যখন বলিয়াছ, তখন ভাইয়ের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে মানিয়া চলিতে হইবে।

আমি লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিলাম, কিছুক্ষণ পরে আহামদ বলিলেন—সরলা, আমাকে চিন্তিত দেখিয়া দুঃখিত হইও না বা ভাবিও না। আমি তোমাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। হৃদয়ে আমার যথেষ্ট বল আছে। আমি বালক নহি। ভাবিতেছি দেশের কথা। দেশটা কি কুসংস্কারে ভরা! হিন্দুসমাজ কি দারুণ অত্যাচারের চাপে দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে। কত দীন হীন নরনারীকে এই কুসংস্কারের চাপে পড়িয়া অনন্ত দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে হইতেছে। ইহাদিগকে কে রক্ষা করে? তুমি দুঃখিত হইতে পার, কারণ ইস্‌লামের তুমি কিছু জান না। এই সব ভুলের কবল হইতে দুর্ব্বল দীন মানুষকে রক্ষা করিবার জন্যই ইস্‌লাম জগতে আসিয়াছিল, মানুষকে উদ্ধার করাতেই ইস্‌লামের চরম সার্থকতা। ভারতের মুসলমানের উপাসনা সেই দিন সর্ব্বাঙ্গীণ হইবে যে দিন প্রত্যেক হৃদয়বান্ মুসলমান প্রতিবাসী হিন্দুকে শত সামাজিক অত্যাচার ও কুসংস্কার হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে। ভারতের হিন্দুকে ইস্‌লামের অতি উন্নত ও অতি মহান্ মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে জীবন পণ করিবে।

হঠাৎ কথা কয়েকটি বলিয়া তিনি বোধ হয় ভাবিলেন, অসহায়

এক ব্যক্তির স্বীয় ধর্ম্মের কুৎসা প্রচার করা হইল! তাই বলিয়া বোধ হয় আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"সরলা ক্ষমা কর!"

অতঃপর বলিলেন—যার কাছে বলি, সেই বলে "হিন্দুর মেয়ে মুসলমানের বাড়ীতে! এর মানে কি মশায়?"

ঘৃণায় কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল। মনে মনে ভাবিলাম—আহামদের মত দেবতুল্য মানুষের কাছে থাকিয়া আমার জাতি গিয়াছে! কি আশ্চর্য্য! যদি কোন লম্পট বদমায়েস হিন্দুর নিকট রূপ বিক্রয় করিতাম—তাহা হইলে তো আমার জাতি যাইত না। ইহারি নাম কি হিন্দুধর্ম্ম? জানিনা কি কারণে নিজের ধর্ম্মের উপর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।

আহামদ বলিলেন—সরলা বিধাতার রাজ্যে তোমার স্থান নাই। দুষ্ট ও বদমায়েসের জন্য অনেক স্থান আছে। তুমি স্ত্রীলোক তাই তোমাকে না খাইয়া মরিতে হইবে। দেখ ভারতবর্ষের মানুষ কত অন্যায় করে। রমণী বলিয়া তোমাকে পরানুগ্রহে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষের জীবন অন্যের অনুগ্রহের উপর ন্যস্ত যে ধর্ম্ম বা যে সমাজ এই ব্যবস্থা দেয় সে মিথ্যা।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আহামদ আবার বলিলেন—সরলা মনে করিও না তুমি হিন্দু বলিয়া তোমাকে অসহায় অবস্থায় পথে ভাসাইয়া দিব। হিন্দুকে ঘৃণা করা—মুসলমানের ধর্ম্ম নহে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মানুষের উপকার করা এবং ব্যথিতের দুঃখ দূর করা মহাপুরুষ মোহাম্মদের শ্রেষ্ঠ উপদেশ। ঘৃণা করা বিধর্ম্মীর কাজ।"

ইস্‌লাম এমন ধর্ম্ম তাহা আমি আগে জানিতাম না। ভাবিতাম যারা বৎসরে একবার করিয়া গরু কোরবানী দেয় তারাই মুসলমান।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—— ✱ ——

তখন রাত্রি চারিটা। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন-পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিতে-ছিলাম।

প্রত্যহ এমন সময়েই উঠিতাম। পুরুষ লোকের স্থান, সুতরাং আমাকে এমন সময়েই উঠিতে হইত। যদি দিনে কখনও বাহিরে যাইবার দরকার হইত পাশের বাড়ীতে যাইতাম। পাশের বাড়ীতে এক হিন্দু ভদ্রলোক পরিবার লইয়া বাস করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কয়েকটী যুবক প্রায়ই আমাকে লক্ষ্য করিত। যখন জলের জন্য কলের কাছে যাইতাম তাহারা আবশ্যক না হইলেও নীচে আসিত। আহামদ প্রতিদিন প্রত্যূষে পাশের কামরা হইতে উঠিয়া আসিতেন এবং হাত মুখ ধুইবার সময় আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। একে বিদেশ, তাহাতে আবার সম্পূর্ণ পুরুষ লোকের স্থান। আমি যদি জিজ্ঞাসা করিতাম—এখন তো জনমানব নাই, এত কষ্ট স্বীকার কেন? তিনি বলিতেন—ভগ্নীর জন্য ভাইয়ের কোন কষ্ট হয় না।

সে দিন রাত্রি তিনটার সময় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপণপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিতেছিলাম। সহসা একটি যুবক পার্শ্বের আঁধার হইতে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পরে শুনিয়াছিলাম এই যুবকটী উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এরূপ অশ্লীল ভাষাযুক্ত মানুষ জীবনে দ্বিতীয়টা দেখি নাই।

যুবকটী পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল অতিবাহিত হইয়া গেল তত্রাচ তিনি পথ ছাড়িতেছিলেন না। আহামদ একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে কহিলেন—জনাব! একটু সরিয়াই দাঁড়াইলে ভাল হয়।

যুবক অকস্মাৎ বিনা কারণে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—কেন আমি সরিব? একটা বেশ্যাকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে?

আহামদ তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমি সরিয়া আসিলাম।

সেই যুবক কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আহামদের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—বলি আহামদ মিঞা! মেসের ভিতর এরূপ গুপ্ত প্রেমের অভিনয় কেন?

আহামদ ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন—কি কথা বলিতেছেন? ইহার অর্থ কি? আপনার মুখে এরূপ কথা শোভা পায় না। আপনি শিক্ষিত ও জ্ঞানী।

যুবক কহিলেন, তোমার নিকট হইতে কোন প্রশংসাপত্র চাহি না। এটা সোণাগাছি বা চিৎপুর নয়। যদি লালসার আগুন এত বাড়িয়া থাকে তবে আমার সহিত যাইও, সৌন্দর্য্যভোগের সুবিধা করিয়া দিব। আর ওটাকে সঙ্গে রেখেছ কেন? ওকেও সেখানে রেখে এস।

আহামদ বলিলেন,—বটে! আমি কি আপনার মত চরিত্রহীন? আপনি কি মনে করিয়াছেন, যদি শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য আপনার মত সয়তান হওয়া হয়, তবে সাহিত্যের একখানা বইও আমি পড়িতে চাহি না। ইহাই কি শিক্ষা? আপনি যে মিথ্যা কথা বলিলেন তজ্জন্য আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত।

উদ্ধত যুবক তাহার হস্তস্থিত বদনা দিয়া আহামদের মাথায় সজোরে

এক আঘাত করিল। রক্তধারা পড়িয়া আহামদের গায়ের কাপড় সিক্ত হইয়া গেল। আহামদের মাথার এক পার্শ্ব একেবারে কাটিয়া গেল। আমি দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার মাথা ধরিলাম।

গোলমালে ছেলেরা নীচে নাবিয়া আসিয়াছিল। আমি ও মুহিত ধরাধরি করিয়া আহামদকে ঘরের ভিতর লইয়া আসিলাম।

সেই যুবক উপর তলা হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন—ঘুঘু দেখিয়াছে, ফাঁদ দেখে নাই। যেন একটা খেলা। লেখা জানে না পড়া জানে না। আর ঞ্জি করের গোয়ালঘরের গরু হইয়া আবার আমার মত শিক্ষিত লোকের সহিত তর্ক করিতে আসে? আমি এখনই উহার পিতার কাছে সব ব্যাপার তার করবো।

শুনিলাম আর একটি যুবক তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিতেছেন,—কেন সাহেব, এত ক্রোধের কারণ কি? ছুকরী মামা যদি মেসে ভাত রাঁধিতে পারে, তবে আহামদ মিঞার দেশীয় একজন বিপন্না ভদ্ররমণী কয়েকদিনের জন্য এখানে থাকিতে না পারিবেন কেন?

সেই উচ্চ শিক্ষিত যুবক কহিলেন—সাহেব, আপনার বাড়ীও তো যশোরে। আর মুখ তুলিয়া কথা বলিবেন না, সব বুঝতে পেরেছি।

যুবক তাহার বন্ধুবান্ধব লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সকলেই কহিলেন, ইহার একটা ব্যবস্থা হওয়া চাই। আমাদের একটা সম্মান আছে তো।

একজন বলিলেন,—সাহেব! বকাটে ছেলে না হলে কি আর ডাক্তারী পড়ে। ওদের সঙ্গে মেশা আমাদের ঠিক হয় নাই। নিজের সম্মান নিজেরাই নষ্ট করেছি। 'তার' যদি করতে হয় তবে এখনই কর।

বুঝিলাম সকল কলহের মূল আমি। হায়! এই অশিক্ষিত যুবক আহামদের মধ্যে যতটুকু মনুষ্যত্ব দেখিতেছিলাম এমন আর কাহারও মধ্যে দেখিতেছিলাম না। জিজ্ঞাসা করি শব্দশিক্ষার জন্যই কি এত ঘটা? এত কলম কালি ব্যয়?

ইহার পর কয়েকদিন কাটিয়া গেল।
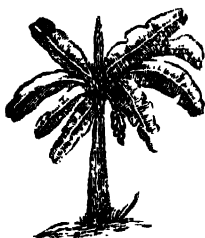
নবম পরিচ্ছেদ।

তখন সন্ধ্যা। তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদের আলো একটু একটু দেওয়ালের গায়ে প্রতিভাত হচ্ছিল। আহামদ বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন।

ভাবিতেছিলাম আর কতকাল সেখানে থাকিতে হইবে।

আহামদকে ডাকিয়া কহিলাম—ভাই, আপনার শত্রু বাড়িতেছে। কাজ কি এই সামান্যার জন্য এত বিপদ্ মাথায় টানিয়া আনা?

আহামদ হাসিয়া কহিলেন—তুমি মনে করিয়াছ, বিপদে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। বিপদ্ যতই বাড়িবে আশ্রিত ও সত্যকে আমি ততই টানিয়া ধরিব।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—সহায়শূন্যা রমণীর কোথায়ও দাঁড়াইবার স্থান নাই। পরের অনুগ্রহে তাহাদিগকে রাখিতে হয়। যদি সে অনুগ্রহ তাহাদের ভাগ্যে না জুটে, তবে হয় তাহারা মরিবে না হয় পাপ করিবে।

আমি কহিলাম—ভিক্ষা করিয়া খাইব। তিনি কহিলেন—ভিক্ষা করিয়া কাল কাটাইতে পারিবে না।

পৃথিবী অনুগ্রহে চলিতেছে না। প্রত্যেক দ্রব্যের আবশ্যকতা আছে। ভিক্ষা করা মনুষ্যত্বের প্রতি ঘোর অবমাননা। জগতে কোন মানুষ কোন মানুষের ভাত খাইবার ও কথা কহিবার ক্ষমতা অপহরণ করিতে পারে না।

নবম পরিচ্ছেদ

এমন সময় সহসা আহামদের পশ্চাৎ দিক্ হইতে কে যেন কেন কাঁদিয়া উঠিলেন। চমকিতা হইয়া চাহিয়া দেখিলাম দুইজন রমণী এবং একজন বৃদ্ধ লোক।

আহামদ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ ভদ্র লোকটার পদ চুম্বন করিলেন।

রমণীর মধ্যে একজন প্রৌঢ়া, অন্যজন সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী। আহামদ বিস্মিত হইয়া কি কহিতে যাইতেছিলেন এমন সময় সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহাকে ভীষণ ভাবে প্রহার আরম্ভ করিলেন।

রমণীদ্বয় প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যুবকেরা দূরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা সকলেই আহামদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেছিল।

আহামদের মাতা তাঁহার পুত্রবধূর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—সয়তানি! কাফের, আমার সোণার প্রতিমা বধূমাতাকে পথে ভাসাইতে বসিয়াছ! তোমার স্থান কোথায়, নরকের কীট! এক সতী সাধ্বীর বুকে ছুরি দিলে কি তোমার ভাল হইবে?

ভয়ে আমার পা কাঁপিতেছিল।

আহামদের আমি কেহ নহি। দুদিনের পরিচয়ে বুঝিয়াছিলাম, তিনি দেবতা অপেক্ষাও মধুর ও পবিত্র। আর ইঁহারা এত আপনার হইয়াও এই মহামানুষের জন্য কিছুমাত্র সহানুভূতি পোষণ করেন না।

এত মানুষের মধ্যে তাঁহাকে এমনভাবে অপমানিত হইতে দেখিয়া আমার কষ্ট হইতেছিল। তাঁহার সতী সাধ্বী স্ত্রী মিট্ মিট্ করিয়া হাসিতেছিল!

উভয়কে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলাম। অত্যন্ত ঘৃণার হাসি হাসিয়া

মুখ ঢাকিয়া আহামদের মাতা কহিলেন—ওমা! পতিতার আবার ভদ্রতা দেখ!

আহামদ অত্যন্ত ব্যথা ও বিনয়মাখা স্বরে কহিলেন—মা! ও পতিতা নয়। ওকে পতিতা বল্লে আমাদের পাপ হবে। সে এক জন ভদ্র-মহিলা। সংসারশূন্যা বলিয়া তাহাকে পতিতা বলা লজ্জাজনক।

এই সময় মেসের ম্যানেজার নামিয়া আসিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে বুঝিলাম তিনি সব জানেন। তাঁহারি ইঙ্গিতে ছেলেরা আহামদের পিতা মাতা ও স্ত্রীকে তার করিয়া আনিয়াছে। চাকরকে দুইখানি চেয়ার আনিতে বলিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন "কে রে মেয়েটী বাহিরে আয় তো।"

আহামদ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ম্যানেজারকে কহিলেন,—এ কি সাহেব? আপনি একজন শিক্ষিত লোক। শুনিয়াছি আপনি একজন বড় দরের রাজকর্ম্মচারী হইবার জোগাড়ে আছেন। একজন ভদ্রমহিলার সহিত এমন করিয়া কথা বলিতেছেন কেন?

ম্যানেজার কহিলেন—তোমার নিকট আমি ভদ্রতা শিক্ষা করিতে চাহি না।

আহামদের পিতা উৎসাহিত হইয়া কহিলেন—মহাশয়! আমার সমস্ত ক্ষমতা আপনাকে অর্পণ করিলাম।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি আবার কহিলেন—মৌলবী সাহেব, আপনি আমার দেশের লোক। পুত্র আমার এমন করিয়া বংশে কলঙ্ক লেপন করিল।

ম্যানেজার আহামদের পিতার হাত জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—ব্যস্ত হইবেন না। ব্যাপারটা যে এত সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে

তাহাত আগে জানিতে পারি নাই। জানিলে অনেক আগেই ইহার প্রতিবিধান করিতাম। আপনি চিন্তিত হইবেন না।

ঘরের মধ্য হইতে ম্যানেজার বাবুর সহানুভূতিতে মুগ্ধ হইয়া আহামদের মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন।

ম্যানেজার আবার সকলকেই সহানুভূতি ও সান্ত্বনা জানাইয়া স্থির হইতে বলিলেন।

অতঃপর প্রকোষ্ঠের দরজার দিকে তাকাইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া আবার তিনি কহিলেন,—কই বাহির হইতেছিস্ না যে?

বাহির হইয়া যাইতেছিলাম। আহামদ দৃঢ়স্বরে কহিলেন—সরলা, আমার অনুমতি না লইয়া কোথায় যাইতেছ? একটু দাঁড়াইলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে ম্যানেজার মিষ্টার ওহিদ আমার বাম কক্ষে পদাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন হারামজাদি! এখনও পরের ছেলেকে ভুলাইবার বাসনা।

ক্রুদ্ধ সিংহের মত আহামদ তাঁহার তাবৎ সুপ্ত তীব্রতা জাগ্রত করিয়া কহিলেন—একজন অসহায় - নিরপরাধ স্ত্রীলোকের অঙ্গে পদাঘাত করিয়া একি কাপুরুষতার পরিচয় দিলেন? আমিই তো উহাকে দাঁড়াইতে বলিয়াছি।

অতঃপর আমাকে আড়ালে রাখিয়া আহামদ পকেট হইতে তাহার ডাক্তারী অস্ত্রের কেশ বাহির করিলেন। একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা মিষ্টার ওহিদের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি যে সয়তান এই দুর্ব্বলা সহায়হীনাকে পুনরায় অপমান করিতে আসিবে, তাহাকে এই বিষাক্ত তীব্র-অস্ত্র দিয়া সাংঘাতিক রূপে আঘাত করিব। এই অস্ত্র অতি ভয়ানক। ইহার সামান্য স্পর্শে মানুষের বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।

সকলেই নির্ব্বাক্। ওহিদ ব্যাঘ্রতাড়িত হরিণশিশুর মত সন্ত্রাসিত হইয়া বসিয়া থাকিল। কেহই কথা বলিতে সাহস করিল না। কেহ আহামদের দিকে অগ্রসর হইল না।

আহামদ আমার দিকে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে কহিলেন—সরলা, বাহির হইয়া পড়।

আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। কেহ বাধা দিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

———•———

প্রায় একমাস পরের কথা। এক খোলার ঘরে বাস করি।

আহামদ এক পার্শ্বে থাকেন। আমি এক পার্শ্বে থাকি। আমার আহার আমি প্রস্তুত করি, এবং আহামদ তাঁহার নিজের আহার প্রস্তুত করেন।

কেমন করিয়া কি হইল, বলিতেছি। সেই দিন আমরা নিরুপায় হইয়া এক হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করি। পরদিন প্রাতঃকালে গাড়ী ঠিক করিয়া বাড়ী ভাড়া করিতে বাহির হই। আমার নদীর ধারে থাকিবার ইচ্ছা হওয়ায় বাসা হাওড়ার অনতিদূরে লওয়া হইয়াছে।

ঘরখানি বেশ বড়। স্নানের কল দুটি।

আহামদ সাহেববাড়ীতে একটা ৫০৲টাকা বেতনের কাজ ঠিক করিয়া লইয়াছেন। কিছু ঔষধ পত্র ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে। দরিদ্র কুলী ও মুটেদের চিকিৎসায় মাসে ২০৲ ২৫৲ টাকা হইতে লাগিল।"

অতঃপর সরলা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন,—ফ্লোরা! তোমার মনে আছে আমি অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম। বর্ত্তমান বিপদ্ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে, তিনি আমাকে শিল্প শিক্ষা দিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অবসর সময়ে তিনি আমাকে নানাবিধ শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

পাঁচ ছয় দিন অন্তর তিনি একখানি বড় বড় ইংরাজী পুস্তক ক্রয়

করিয়া আনিতেন। কত বড় বড় জ্ঞানের কথা তিনি আমাকে মাঝে মাঝে বুঝাইয়া দিতেন। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সে সব শুনিতাম।

এই সময় হইতে জীবন নূতন রকমে দেখিতে লাগিলাম। মানব সমাজ ও পৃথিবী সম্বন্ধে আমার নূতন ধারণা জন্মিল।

মুসলমান সমাজকে কোন দিন শ্রদ্ধার চোখে দেখি নাই। এই আশ্চর্য্য মুসলমান মহাপুরুষের স্পর্শে আসিয়া আমি নূতন মানুষ হইয়া উঠিলাম। এই সময় হইতে মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমি মনোযোগী হইলাম। মুসলমানের কোরাণের কথা যতই শুনিতে লাগিলাম ততই আমি স্তম্ভিত হইতে লাগিলাম।

প্রথমে যখন তাঁহার সহিত মেসে ছিলাম তখন তিনি দিবসে পাঁচবার উপাসনা করিতেন। এখানে আসা অবধি তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। একদিন ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ভাই, আপনি আজ কাল উপাসনা করেন না কেন? তিনি কহিলেন—পিশাচের জন্য মসজিদ আছে, কিন্তু ব্যথিত বা পীড়িতের জন্য দাঁড়াইবার স্থান নাই। এরূপ জঘন্য উপাসনার আবশ্যকতা কি? খোদার সহিত এরূপ ভণ্ডামি কেন? দুর্ব্বৃত্তেরা মনুষ্যত্বের কিছু বুঝে না, কিন্তু উপাসনা করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করে। টাকা চুরি করিয়া 'মিলাদের' ব্যবস্থা করে। এরূপ উপাসনায় কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া স্বীকার করি না। মূর্খের আবার উপাসনা কি? পশুর সহিত উপাসনা করিতে লজ্জা বোধ করি।

আমি কহিলাম—আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য। মূর্খের উপাসনার মূল্য নাই, কিন্তু জ্ঞানীর উপাসনার ত মূল্য আছে। ঈশ্বর জ্ঞানীর উপাসনারই বড়াই করেন। বন্ধুর সহিত নিভৃতে যতই কথা বলা যায় প্রণয় ততই প্রগাঢ় হয়। পিশাচেরা মসজিদে যায় বলিয়া ভাল লোকের

কি যাইতে নাই। ঈশ্বর, ভক্তকেই ব্যথা দিয়া পরীক্ষা করেন। কষ্টে পড়িয়া ব্যথা পাইয়া যে ভক্তের ভক্তি শিথিল হয়, সে কি ভক্ত সে কি জ্ঞানী না প্রণয়ী? সর্ব্বদাই সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার দয়ার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিই ধার্ম্মিক। তারপর হইতে তিনি পুনরায় উপাসনা আরম্ভ করেন।

পুস্তকাদি রক্ষা করিবার জন্য কয়েকটী আলমারী ক্রয় করিয়া আনিলেন তাহার মধ্যে তিনি বড় বড় ইংরাজী, আরবী ও ফার্সী ভাষায় পুস্তক রাখিয়াছিলেন। তিনি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সেই সব পুস্তক দেখিতেন। বাঙ্গালা পুস্তকের জন্য তিনি একটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর আলমারী আনিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গালা বইগুলি তিনি মাথায় করিয়া লইতেন। অজানিত নগণ্য লেখকগুলির নাম তিনি অত্যন্ত ভক্তি ও আদরের সহিত চুম্বন করিতেন।

সাধারণতঃ তাঁহাকে রাত্রি এগারটা বারটার সময় এবং সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে সাহিত্যালোচনা করিতে দেখিতাম।

তাঁহাকে কখনও বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে দেখি নাই। বিদেশী দ্রব্যের নাম শুনিলে তিনি শিহরিয়া উঠিতেন। একদা কতকগুলি লোককে মোটর গাড়ী ক্রয় করিতে দেখিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।

একদা এক উপবীতধারী ব্যক্তিকে বিলেতী বুট পরিয়া যাইতে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—চাহিতে পারি না, সে মাটির উপর পা না দিয়া দরিদ্রের বুকের উপর পা দিয়া চলিতেছে।

তাঁহাকে যে বড় কেউ শ্রদ্ধার চোখে দেখিত না। তাহা পরের মর্ম্মবিদারক ঘটনা হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম। সেই সব অত্যাচার ও অবিচারের কথা ভাবিতে পারি না। ভাবিলে না কাঁদিয়া থাকিতে পারি নাই। যদি কেহ কখনও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিত তিনি যাইতেন না।

আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিতেন—ঈশ্বর উদ্দেশ্যে কে কাহাকে নিমন্ত্রণ করে? তাহা ছাড়া যাহা আহারের জন্য আমার সম্মুখে আনিয়া দেয় তাহাতে দেখি কেবল মানুষের রক্ত।

তাঁর গান গাহিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সমস্ত আকাশ পৃথিবী তাঁহার গানের মূর্চ্ছনায় কাঁপিতে থাকিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—— *0* ——

আমি মুসলমান হইয়া গেলাম।

ফ্লোরা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—বটে! তুমি মুসলমান হইলে?

সরলা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, হাঁ! মুসলমান হইলাম, আহামদের অসাধারণ মনুষ্যত্বের কাছে আমি নত হইয়া পড়িলাম। কোরাণের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিলাম। নিজের ধর্ম্মের উপর একটা গভীর অশ্রদ্ধা হইল। দেখিলাম হিন্দু-ধর্ম্মটা মানুষের উপকার অপেক্ষা ক্ষতি অধিক করে। ইহার অত্যাচারে পড়িয়া শত শত মানুষ নিরন্তর জর্জ্জরিত হয়। কেবল কুজ্‌ঝটিকা—কেবল তর্কের উপর তর্ক! কোথায়ও মীমাংসা নাই।

দেখিলাম এস্‌লাম পৃথিবীকে ঘৃণা করে না। যত্নে নির্ভরতা, মানুষের ও আত্মার স্বাধীনতা রক্ষা করা এস্‌লামের এক আদেশ। উহা মাথার খেয়াল নহে। ধর্ম্মের উহা অঙ্গ। এস্‌লাম দরিদ্রকে সাহায্য করা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করে। জ্ঞান আহরণ এসলামের এক প্রধান আদেশ। মনুষ্যত্ব এস্‌লামের প্রধান ভিত্তি। এস্‌লাম মানুষকে বিলাসী হইতে নিষেধ করে। কোরাণে অর্থের অপব্যবহারকারীদিগের জন্য শাস্তির ভয় দেখান হইয়াছে। এমন কিছু মহান্ ও প্রয়োজনীয় কথা নাই যাহা কোরাণে নাই। মানুষ যদি এই একমাত্র গ্রন্থ হৃদয়ঙ্গম করে, সে দেবতা হয়। কোন জাতি কোরাণকে সম্বল করিয়া নীচে পড়িয়া থাকিতে পারে না। সমস্ত পৃথিবীর গ্রন্থ এক দিকে, কোরাণ একদিকে। সমস্ত

মানুষের দুঃখ কষ্টের ঔষধ ইহাতে আছে। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ও সম্মানের দাবীর কথা কোরাণে লেখা আছে। মুসলমান জাতি এই কোরাণকে ভুলিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে। যখনই তাহারা কোরাণ হৃদয়ঙ্গম করিবে তখন তাহারা পৃথিবীর গুরু হইবে। ইউরোপ বহু সত্য নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত। তাহারা কোরাণের সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া এক মহা আলোকের সহিত পরিচিত হউক। সমস্ত ইউরোপের সম্মুখে এক মহা গ্রন্থ পড়িয়া আছে। তাহারা একবার দেখুক এস্‌লাম কি মহা দান; কোরাণ পড়িয়া এসলামকে চিনিতে হইবে। মুসলমানকে দেখিয়া নহে।

ফ্লোরা কহিল,—প্রিয় সিরেল, তুমি এত বড় মহাধর্ম্মের কথা বলিলে। আমি ত ইহার কোন খবরই রাখি না। তুমি এই মহাধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান হইলে কেন?

সরলা কহিল—মুসলমান যীশুখৃষ্টের মহামানবতাকে সম্মান করে। তাহার ধর্ম্মের আদেশ তাহাই। আমি যীশুকে বিশ্বাস করি, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হয় নাই! আরও গুরুতর কারণ আছে। এদেশে স্ত্রীলোকের জীবন বড় দুঃখময়! অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া তাহারা মানিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। কি কারণে খৃষ্টান হইলাম তাহা বলিব না। যাক ও কথা। আমার জীবনের বাকী অংশ শ্রবণ কর।

বৈশাখ মাস। ভীষণ ওলাউঠায় কলিকাতাবাসী নিয়ত সন্ত্রাসিত।

এই দীর্ঘ কয়েকমাস কাটিয়া গেল। এ যাবৎ কেহই আমাদের সংবাদ লইল না। বিধাতার পরীক্ষা কত ভয়ানক তা কে জানে। হয়ত তিনি তাঁর বন্ধুর প্রাণের রক্ত পান করিতে আনন্দ বোধ করেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার কাছে একখানা পত্র লিখিলেন

না। কোন সময় তাঁহার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেন মাত্র।

ওলাউঠা ক্রমেই ভয়ানক আকার ধারণ করিতেছিল। হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাইতে লাগিল। আহামদের মুখে কিন্তু বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই। তিনি বলিতেন অনন্তের পাথকের কাছে মৃত্যুর কোন মূল্য নাই।

বিশেষ করিয়া ওলাউঠা রোগীর চিকিৎসার জন্ম তিনি এক বাক্স হোমিওপ্যাথী ঔষধ ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং সকালে বিকালে আমাকে ঔষধ ব্যবহার শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

দীন দুঃখীরা দিনরাত্রি ঔষধ লইতে আসিত। সেবারে এই করাল ব্যাধির হস্ত হইতে অতি অল্প লোকই রক্ষা পাইয়াছিল। হোমিওপ্যাথী ওলাউঠার ভাল ঔষধ হইলেও, সেবারে অধিকাংশ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। তিনি প্রাণপণে দরিদ্রের সেবা আরম্ভ করিলেন। যাহাদের সামর্থ্য ছিল না তাহাদিগের নিকট হইতে কোন পয়সা লইতেন না, এমন কি প্রয়োজন হইলে নিজ হইতে তাহাদের জন্ম পথ্যের ব্যয় প্রদান করিতেন।

সে দিন বৃহস্পতিবার, বৈকাল বেলা এক রোগী দেখিতে যাত্রা করিলেন। সে দিন তাঁহার অত্যন্ত বিলম্ব হইল। বাসায় রাত্রি ১২টার সময় ফিরিলেন। দেখিলাম মুখে তাঁহার হাসি।

এত রাত্রে ফিরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—এত রাত্রে কি আহার করিবেন? তিনি কহিলেন,—তাড়াতাড়ি কয়েকখানা লুচী প্রস্তুত করিলে হয়।

বাজার হইতে সেই রাত্রেই তিনি ময়দা ও ঘৃত লইয়া আসিলেন।

এই ঘৃতই কাল হইল। কলিকাতার বহু বদমায়েস লোক নানা প্রকার মৃত অথবা জীবন্ত জীব জানোয়ারের চর্ব্বি ঘি নামে বিক্রয় করে। জল ও মেসিন অয়েল দিয়া এই প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়। 'বহু হিন্দু এই সব চর্ব্বি ঘি বলিয়া—মফস্বলে বিক্রয় করে। বঙ্গের সমস্ত দোকানে এই সকল ঘৃত ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে গরুর চর্ব্বীও থাকে। হিন্দু মুসলমানের হাতের জল না খাইয়া ভাঙ্গা মর্য্যাদা টানিয়া জোড়া দিতে চায়, মানুষকে ঘৃণা করিয়া বড় হইতে চেষ্টা করে, সেই হিন্দু বিবাহ ও শ্রাদ্ধ সভায় এই সব গরুর চর্ব্বি দেওয়া মিষ্টান্ন উদরস্থ করে। সমস্ত বঙ্গ দেশের হিন্দু জাতি হারাইয়াছে। এই জাতি নষ্ট করার প্রধান পাণ্ডাই আবার হিন্দু। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা এই সব চর্ব্বি মফস্বলে চালান দিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন, আর সেই টাকা দিয়া তাঁহারা দেবদেবীর পূজা করেন!

আমি লুচী প্রস্তুত করিতেছিলাম। তিনি পকেট হইতে খাতা বাহির করিয়া কি যেন লিখিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি লিখিতেছেন ভাই? তিনি কহিলেন,—কিছু বুঝিবে না।

আমি আবার অনুরোধ করায় তিনি তাহা আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। আমার সব মুখস্থ আছে।

ফ্লোরা কহিল,—তোমাদের বাঙ্গালা কবিতা কেমন হয়—শুনিতে চাই। বল, শুনি।

সরলা বলিল,—তুমি কিছু বুঝিবে না। তাঁহার আরও দুইটী কবিতা আমার মুখস্থ আছে। মহামানুষের শেষ স্মৃতিরূপে আমি মরণ পর্য্যন্ত সেগুলি বুকে করিয়া রাখিব। ভাব তার অসাধারণ। বিরাট মনুষ্যত্বের ছায়া তার প্রতিছত্রে ছড়ান। মানুষের জন্য একটা গভীর বেদনা

কবিতায় সর্ব্বাঙ্গ জঁড়াইয়া আছে। চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া—ছাতের দিকে তাকাইয়া সরলা বলিল পরে শুনাইব।

রাত্রিকালে সেই ঘৃত ও লুচি খাইয়া নামাজ শেষ করিয়া আমরা শুইয়া থাকিলাম। হায়, যদি জানিতাম তাহা হইলে কি নিজের হাতে আমার ভাইয়ের হাতে বিষের পেয়ালা তুলিয়া দেই! সরলা কাঁদিয়া আবেগকম্পিত স্বরে কহিল—ফ্লোরা, সে আমার ভায়ের চেয়েও অধিক ছিল। সেই মহাপুরুষের সঙ্গে আসিয়া আমার মাটীর দেহ সোণা হইয়া গিয়াছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

——*০*——

প্রাতঃকালে নামাজ শেষ করিয়া আগামদ কহিলেন, "সরলা, শরীর যে বড় ভাল বোধ হইতেছে না!" ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ভাই, কি হইয়াছে?"

"এমন বিশেষ কিছু নহে। অনেক রাত্রি জাগিয়া থাকায় একটু পেটের অসুখ হইয়াছে।"

তিনি যাহাই বলুন, অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রাণ কেন যেন কাঁদিয়া উঠিল। মনে মনে ভগবানকে বলিলাম "ভগবান্! দুঃখিনীকে ভুলিও না।"

মুখের কথা মুখেই রহিল। আহামদ হঠাৎ একবার বমন করিলেন, আকস্মিক দুর্ব্বলতায় তিনি বিছানায় পড়িয়া গেলেন। দৌড়িয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হইল?"

তাড়াতাড়ি মুখ প্রক্ষালনের জল আনিলাম। আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া আহামদ জিজ্ঞাসা করিলেন—কাঁদ কেন সরলা? এখনই সারিয়া যাইবে। পেটে একটু অসুখ হইয়াছে বই তো নয়।

আমি ভাবিতেছিলাম তাঁহার অমঙ্গলের কথা! আর তিনি আমার চোখের জল দেখিয়া ব্যথিত হইতেছিলেন।

বাক্স আনিয়া কয়েক ফোঁটা ঔষধ ঢালিয়া এক মাত্রা খাওয়াইলাম।

তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন—ভয় কি সরলা! আমরা আমাদের সুখের জন্য যত না ভাবি, ঈশ্বর তাহা অপেক্ষা আমাদের মঙ্গলামঙ্গল অধিক ভাবেন। ঈশ্বরের গৌরব লইয়া যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহাদের মৃত্যুও নাই, ধ্বংসও নাই।

আরও দুইবার ঔষধ খাওয়াইলাম; কিছু হইল না। ক্রমশঃ তিনি নিস্তেজ হইয়া যাইতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট পরে ভেদ বমন প্রবলবেগে আরম্ভ হইল।

সে দিন কেহ ঔষধ লইতে আসিল না। পৃথিবী আপন মত ব্যস্ত ছিল, বাতাস তেমনিই বহিতেছিল। আমার ভিতর কি হইতেছিল তাহা খোদা জানেন।

ক্রমে বেলা ১২টা বাজিল। প্রখর রৌদ্র বাতাসকে ভীষণ করিয়া চারিদিকে আতঙ্কসংবাদ পাঠাইতেছিল।

'ভাই, ভাই' বলিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন ভাল ডাক্তার আনিব কি?

বাড়ীতে আর কোন লোক ছিল না, তবুও ইচ্ছা করিতেছিল, কোন ভাল ডাক্তার ডাকিয়া আনি।

আহামদ একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন—সরলা এত ব্যস্ত হইতেছ

কেন? মরণ কি কেহ রোধ করিতে পারে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগতে আসিয়াছি, আবার তাঁহারি ইচ্ছায় ফিরিয়া যাইব, ইহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। সুবিধা অসুবিধা তিনিই চিন্তা করিবেন। মৃত্যুর জন্য আবার দুঃখ কি? মৃত্যুতে দুঃখ করিলে পাপ হয়। ভগবানের কাজের উপর সমালোচনা কে করিবে? মানুষ নিজের কল্যাণ ও সুখের জন্য কি আপনারাই ব্যস্ত। উপরে এক মহাপিতা আছেন। তিনি নিয়ত মানুষের মঙ্গল চিন্তা করেন। কাঁদিও না। কাঁদিলে পাপ হয়।

"কে পুত্র?—কি পিতা? সকলেই মহাপিতার ভৃত্য। জগৎ এক মহা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চঞ্চল। একই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া আকাশে চাঁদ উঠে, মর্ত্ত্যে বাতাস বহে, স্রোতস্বিনী কলধ্বনি করিয়া যায়। উহাঁর জন্য রাজা, উহাঁরি জন্য শাসন, উহাঁরি জন্য যুদ্ধ।

"আমরা তাঁহারই ভৃত্য। তাঁহারই কর্ম্ম সাধন উদ্দেশ্যে পিতা হইয়া পুত্রকে কোলে তুলি, স্বামী হইয়া স্ত্রীকে ভালবাসি, জননী হইয়া সন্তানকে বক্ষে তুলিয়া লই। কেবল কর্ম্ম করিব। কিসের বেদনা? ডাক্তার কি করিবে? কষ্ট উপশমের জন্য ঔষধ আবশ্যক। কষ্ট আমার হইতেছে না।

"মানুষ পৃথিবীর এই সামান্য কষ্টে আকুল হয়। পরলোকের অনন্ত কোটি বৎসরের অনন্ত ব্যথা সে কি প্রকারে সহ্য করিবে?

"মরিবার জন্য ভয় নাই। পিতার কর্ম্ম সারিয়া পিতার কাছে চলিয়া যাইব। পিতা অত্যন্ত দয়াময়—তিনি বন্ধু, তিনি সখা, তিনি প্রিয়, তিনি প্রাণ, তিনি প্রভু, তিনি রক্ত, তিনি মাংস।

"ঈশ্বরের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিলাম। সর্ব্বদা ধীরে কথা বলিও।"

আমি কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—সত্যই কি আপনি চলিয়া যাইতেছেন! আমার ভবিষ্যৎ কি হইবে, জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা বোধ হইল।

আহামদ স্থির হইয়া বলিলেন,—এত ভীতা হইতেছ কেন?

কোন ঔষধে ফল হইল না। বহুবার জলবৎ বমন হইতে লাগিল। শীতল জল পানের প্রবল বাসনা ছিল। অস্থিরতা, প্রলাপ, এপাশ ওপাশ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। হস্তমুট বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। পেটে ভয়ানক বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। জলপান কালে কল কল শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।

এই সময় পকেট হইতে তিনি খাতা বাহির করিয়া দিলেন, তাহাতে বহু কবিতা ছিল। খাতাখানি আমার হাতে দিয়া কহিলেন—নষ্ট করিও না। আমি সাদরে সেখানা আঁচলে বাঁধিয়া রাখিলাম।

ক্রমশঃ তিনি নিস্তেজ হইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার কথা কহিবার শক্তি রহিল না। কোথায় তাঁর পিতা মাতা যাহারা একদিন তাঁর শিশুমুখে চুম্বন দিয়াছিলেন।

কোথায় আহামদের স্ত্রী, যিনি শৈশব হইতে কোন অজানিত পল্লীগৃহে বুক ভরা আশা লইয়া—তাঁহারি প্রতীক্ষায় জীবনমরুর শুকনো পথে দাঁড়াইয়াছিলেন, তার পর একদিন প্রভাত বেলা বিধাতার সম্মুখে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন।

ভাবিতেছিলাম—আমি-কে? আহামদ কেন আমায় পথের মাঝ থেকে ডেকে নিলেন? তাঁর সুখের জীবন বেদনায় ভরিয়া ফেলিলেন!

তাঁর স্নেহের উপর আমার কি অধিকার ছিল? আমি হতভাগিনী, কেন দুঃখের কথা বলিয়া এই অজানিত দেবতাকে সমস্ত বিশ্ব হইতে টানিয়া আনিয়া নিজের করিয়া লইলাম।

তিনি কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। হস্ত নাড়িয়া আমাকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর সম্পূর্ণ পতন অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইল। এসিড হাইড্রোসায়নিক, পটাস সায়ানায়েড কোন ঔষধে ফল হইল না।

. ঔষধ খাওয়ান পরিত্যাগ করিলাম। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস বহিতেছিল। আমি ভক্তিশূন্য হৃদয়ে কহিতেছিলাম—আল্লা ছাড়া আর কেহ নাই।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ দেখা দিল। একাকী আহামদের শিয়রে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম।

রাত্রি আটটার সময় আমার বন্ধু আমার দীক্ষাগুরু আমার ভাই চিরদিনের মত চলিয়া গেলেন এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা দমকা বাতাস আসিয়া প্রদীপটাকে নিবাইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—— *০* ——

সমস্ত রাত্রি বসিয়া রহিলাম। মৃতদেহ বলিয়া কোনও প্রকার ভয় ছিল না। মনে হইতেছিল গোলাপগুচ্ছ শুকাইয়া সম্মুখে পড়িয়া আছে।

কাপড় ও ঘরের মেজে ধুইয়া ফেলিলাম। কোন প্রকার ময়লা রহিল না। গৃহ অঙ্গন বিছানা চিরবিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তেও তাহার জড়-দেহের স্পর্শে ধন্য হইতেছিল।

কেমন করিয়া তিনি আমার এত আপন হইয়াছিলেন ভগবান্ জানেন। হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। সে বেদনার কথা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। আহামদ আমার অত্যন্ত আপনার ছিলেন। বিশ্ব হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার কাছে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। আমার কোনও কথা তাঁহার কাছে গুপ্ত ছিল না। ছলনা করিয়া আমি তাঁহার স্নেহলাভ করিতে চেষ্টা করি নাই। জীবনের সকল কথা তাঁহার কাছে খুলিয়া বলিয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি তজ্জন্য অধিক মমতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

আপিস হইতে আসিবার সময় দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। আমাকে দেখিবামাত্র শুষ্ক কর্ম্মক্লান্ত মুখে হাসি ফুটাইয়া তিনি আমাকে নমস্কার করিতেন। আমি লজ্জায় সঙ্কোচে কথা বলিতে পারিতাম না। জানি না কেন তাঁহার জন্য প্রাণ ছিঁড়িয়া যায়।

বিধাতা যাহাকে ভালবাসেন তাহার মাথায় তিনি কঠিন শিলা নিক্ষেপ

করেন। এত কষ্টে ও দুঃখেও কখনও তিনি মুহূর্তের জন্য ম্লান হন নাই। সর্ব্বদা মধুর ও অমায়িক। সকল সময়, সকল অবস্থায়—তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেন।

কেঁদে কেঁদে সারারাত্রি কেটে গেল।

অতি প্রত্যূষে স্নান শেষ করিয়া নামাজ পড়িলাম।

নামাজ পড়িয়া মনে করিলাম, রাস্তার ধারে এনাম হাফেজ কতকগুলি ছোট ছেলেকে কোরাণ পড়ায়, তাহার কাছে আহামদের সমাধির ব্যবস্থা হইতে পারে।

সকাল বেলা এনাম হাফেজ মুখে বিরক্তি মাখিয়া ছেলেদের পড়া বলিয়া দিতেছিল। তাহার তাদৃশ চেহারা দেখিয়া প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। ভয়ে ভয়ে হাফেজ সাহেবকে ডাকিয়া কহিলাম সে ঘৃণার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, কি চাস্?

দেবতা আমাকে নমস্কার করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই, আর আজ পথের ধারে ইহার কাছে এইরূপ ভাবে সম্বোধিতা হইলাম!

কম্পিত স্বরে কহিলাম—এ পাড়ায় যে মুসলমান ডাক্তার ছিলেন। গত রাত্রে তিনি কলেরায় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। আপনি তাঁর সমাধির ব্যবস্থা করুন।

সে ক্রূরের হাসি হাসিয়া কহিল—কেন, তাহার সহিত যে একজন হিন্দু পতিতা ছিল, সে এখন কোথায় গেল? কাফের হইয়া মরিয়াছে। কাফেরের সমাধি দেওয়া শাস্ত্রে লেখে না।

অতিমাত্রা ঘৃণায় বলিলাম,—আমিই সেই কাফের পতিতা।

আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। চোখ ফাটিয়া জল আসিল। খুব কাঁদিলাম। কাঁদা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

ক্রমে অনেক বেলা হইয়া গেল। আহার করিবার 'প্রবৃত্তি ছিল না। আবার দরজায় চাবি দিয়া বাহির হইলাম।

পাড়ার সকল মুসলমানকে অনুরোধ করিলাম। সকলেই কহিল—লোকটি কি জাতি ছিল ঠিক নাই। মুসলমান হলেও সে কাফের হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যাকালে ম্লান মুখে ফিরিয়া আসিলাম। আহামদের দেহ যেমন ভাবে বাঁধিয়া গিয়াছিলাম তেমন ভাবেই ছিল। হৃদয় দুঃখে ছাই হইয়া যাইতেছিল। আহামদ একদা বলিয়াছিলেন—ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া হৃদয়ে শত বৎসর বেদনা ধারণ করিও। দুঃখিত বা অশান্ত হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্যের অবমাননা করিও না। তাহার সেই উপদেশ স্মরণ করিয়া হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতেছিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার ধরায় নামিয়া আসিল। একাকী সেই বাড়ীর ভিতর ভাবিতেছিলাম—সমাধির কি করিব? প্রাণপণে খোদাকে ডাকিতে লাগিলাম।

সমস্ত দিন আহার করি নাই। অসুখ হইতে পারে ভাবিয়া রাস্তা হইতে একটু দুধ আনিয়া পান করিলাম।

তাহার পর মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া একটা প্রদীপ জ্বালিয়া মেজেয় বসিয়া থাকিলাম।

* * * *

মাথার উপর দিয়া প্রহরের উপর প্রহর চলিয়া যাইতেছিল। নিস্তব্ধতা সারা সহরটাকে ঢাকিয়া ফেলিল। দূর অতি দূর হইতে বাতাসে ভাসিয়া অস্ফুট সঙ্গীতধ্বনি আসিতেছিল। আমি একা।

সারা সহরের মানুষ তখন ঘুমাইয়া। ভিতরে একটা আকুল হাহাকার

জাগিয়া উঠিল। নীরব নৈশ আকাশ মথিত করিয়া সারা বিশ্বের বেদনা কাঁদিতেছিল। মানুষের অত্যাচার ও অহঙ্কার, পাপ ও অন্যায় আহত রাক্ষসীর মত আঁধারে আশ্রয় লইয়াছিল।

ভাবিতেছিলাম সৃষ্টির প্রথম দিবস হইতে এত মানুষের ধারা পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া কোথায় চলিয়া যায়? কোথায় তারা এখন? কিসের ধনসম্পত্তি, মান বৈভব, অহঙ্কার ও বিলাস? একখানি ছোট কুটির, একখানা কাপড়। আর বেশী কেন?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া গেল। ১২।১২; তারপর গির্জ্জার ঘড়িতে তিনটা বাজিল। সহসা দেখিলাম সমস্ত আকাশ আলোকিত হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম এক অতি জ্যোতিষ্মান্ মূর্ত্তি বহু দূরে শূন্যে দাঁড়াইয়া। ধীরে ধীরে ছায়ামূর্ত্তি নামিয়া আসিল।

তার পর দেখিলাম, বাসা যেন কোথায় গেল! সহস্র সৌধকিরীটময়ী কলিকাতা কোথায় চলিয়া গেল! আমি এক মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি। বিরাট্ সীমাহীন মাঠ, উষার পর প্রথম স্বর্ণ রৌদ্রে আকাশ মাঠ প্লাবিত। দূরে—ধীরে ধীরে এক স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইতেছিল। স্রোতস্বিনীর কাণায় কাণায় জল ভরা। কোথাও জল তীরভূমি প্লাবিত করিয়া দুই—কূল ছাড়াইয়া চলিয়াছে। সেই জ্যোতিষ্মান্ ছায়া মূর্ত্তি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অত্যন্ত বিস্ময়ে বেশ করিয়া দেখিলাম আহামদের জ্বলন্ত মূর্ত্তি বাতাসের মাঝে কাঁপিতেছে। আমার স্পষ্ট মনে আছে আহামদ হাত নাড়িয়া আমাকে ভীত হইতে নিষেধ করিলেন।

স্রোতস্বিনীর সারা উপকূলে নির্ম্মল স্বচ্ছ জল ঢাকিয়া শৈবালশ্রেণী, আর তার ভিতর দিয়া লোহিতবর্ণের অসংখ্য শতদল।

এমন বিশাল সীমাশূন্য মাঠ জীবনে কখনো দেখি নাই। চতুর্দিকে একটা সূক্ষ্ম কৃষ্ণ-রেখা ছাড়া কিছুই দেখা যাইতেছিল না।

মাঠের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটা ছোট মাটী আঁটা বড় পাথরের স্তূপ। স্তূপের মাথা ক্রমশঃ ছোট হইয়া প্রায় দশহাত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। শ্যামল ঘাস ও লতা পত্রে ঢাকা। আমি নীচে দাঁড়াইয়া খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

আহামদ সেই মাঠের মাঝে সেই পাথরের স্তূপের উপর বসিয়া বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। কি বলিব সে কি সঙ্গীত! সারা আকাশ, সারা বিশ্ব কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

সেই শৈলস্তূপের পাদদেশে আমি। আমার সকল চেতনা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল।

কতক্ষণ পরে আহামদ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—সরলা! ঐ দেখ।

যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার সকল শরীর যেন একটা তাড়িত প্রবাহের ভীষণ আঘাতে সহসা নম্র হইয়া পড়িল। স্পষ্ট দেখিলাম সেই দূর স্রোতস্বিনীর উপকূলে এক শবদেহ। অসংখ্য শৃগাল কুকুর উহার চতুর্দ্দিকে। আরও ভাল করিয়া দেখিলাম—উহা আহামদের মৃতদেহ!

উন্মাদিনীর মত সেই দিকে ছুটিয়া চলিলাম। আমি চীৎকার করিয়া বলিতেছিলাম—ওরে শৃগাল, কুকুর! আহামদের মৃতদেহ আমারই সম্মুখে ছিঁড়িয়া খাইবি, আর আমি উহা দেখিব।

'কর কি?' 'কর কি?' বলিয়া আহামদ বাঁশী ফেলিয়া আমার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

দেহের তাবৎ শক্তি দিয়া দৌড়িতেছিলাম, সুতরাং সহসা আমাকে ধরিতে পারিতেছিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আর সামান্য কয়েকপদ অগ্রসর হইলেই শব-দেহকে সেই সব হিংস্র পশুর লোল রসনা হইতে রক্ষা করিতে পারি।

আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমারি সম্মুখে আহামদের দেহ শৃগাল কুকুরে টানিয়া খাইবে আর আমি তাহা দেখিব—ইহা সহ্য হইতেছিল না। চীৎকার করিয়া কহিলাম—খোদা! বজ্র দিয়া আমার মাংসের দেহ ধুলি করিয়া দাও!

কিন্তু আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আহামদ আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন।

'কর কি'—'কর কি' বলিয়া তিনি আমাকে আগুলিয়া ধরিলেন।

আমি কাঁদিতে কাঁদিতে অনুনয় করিয়া কহিলাম—কর কি ভাই?

আহামদ কহিলেন—এই দেখ, আমার পানে চাহিয়া দেখ। আমি কত মহিমাময় হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, রক্তমাংসের শরীরে তোমার এত মায়া, কৃমি-কীটময় জড় দেহ শৃগাল গৃধিনী খাইয়া যাক।

দেখিলাম আহামদের মাথায় এক মণিময় উষ্ণীষ। পরণে অতি শুভ্র পাজামা। তিনি রাজার সাজে সজ্জিত।

* * * *

ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখি মেজেয় পড়ে আছি: ঘরের সামনে এক যুবক সন্ন্যাসী গান গাহিতেছেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ।

——•:•:•——

সন্ন্যাসীর বয়স অষ্টাদশ বর্ষের বেশী হইবে না। এমন আশ্চর্য্য সুন্দর যুবক জীবনে কখনো দেখি নাই। তার চোখ দিয়া চাঁদের অমিয় ঝরিয়া পড়িতেছিল।

মাথায় তার স্ত্রীলোকের মত লম্বা লম্বা চুল। সর্ব্বাঙ্গ এক লাল কম্বলে জড়ানো। পরণে একখানা ছোট কাপড়। অথচ অশ্লীলতার চিহ্নমাত্র নাই।

যুবক আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন—কিছু টাকা দিতে পার মা ?

মনে মনে ভয়ও হইতেছিল, আহামদের মুখে বহু সাধু দরবেশের কথা শুনিয়াছিলাম। সাধুদের মধ্যে নাকি সম্রাট্ আছেন। তাঁহারি আদেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন এবং তাঁহারাই মানুষের চোখের অন্তরালে দাঁড়াইয়া নাকি দেশ শাসন করেন। তবে ইহার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল।

এমন নবীন সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি কখনো কল্পনায়ও করিতে পারি নাই।

কহিলাম 'আমার কাছে পয়সা নাই, আঁচলে দুটো সিকি আছে মাত্র।'

সাধু কহিলেন—যাহা আছে সব দাও।

একটু ভীত ও বিরক্ত হইয়া কহিলাম—আমি একটা দিতে পারি, দুইটা দিতে পারি না।

দুইটী সিকি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম—সাহ ছাহেব! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আপনি সাহায্য করিবেন কি?

সাধু কহিলেন—কি বিপদ?

অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলাম—আমার এক আত্মীয় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁর সমাধির কোন ব্যবস্থা হইতেছে না।

দরজা খুলিয়া আহামদের শবের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিলাম—ইনি আমার ভাই। ইঁহার সমাধির ব্যবস্থার কথা বলিতেছি।

সাধু বলিলেন—কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

আমি সাধুর প্রস্তাবে রাজী হইলে তিনি বলিলেন—সন্ধ্যাকালে আসিব। তোমার চল্লিশ টাকা লাগিবে।

হাতে বিলাসের দেওয়া পঞ্চাশটী টাকা আর ডেস্কের ভিতর ৫৲ পাঁচটী টাকা ছিল, আহামদের পয়সা জমা করা হইয়া উঠে নাই। যাহা উপায় করিতেন তাহা প্রায়ই দীন দরিদ্রকে দান করিতেন। কাহাকেও দু আনা, কাহাকেও চার আনা, কাহাকেও একটাকা পর্য্যন্ত দিতেন। সে সব অর্থ যদি থাকিত তাহলে আজ আমাকে এত সহায়শূন্যা ও বিপদ্‌গ্রস্তা হইতে হইত না।

বিলাসের দেওয়া সেই পঞ্চাশ টাকার ভরসায় কহিলাম—আমি চল্লিশ টাকা দিতেই রাজী আছি।

বিলাসের কথা ভাবিতেই সরলার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—○০○—

সন্ধ্যাকালে ফকীরের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। ফকীর যথাসময়ে আরও চারিজন মানুষ সঙ্গে করিয়া আনিলেন। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। একটু ভয় হইতেছিল।

সাহসে বুক বাঁধিয়া, উঠিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহারা আমার সহিত কোনও প্রকার বাক্যালাপ করিলেন না। অনেকখানি কাপড় আর একখানা কাঠের তক্তা তাঁহারা সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

ধীরে ধীরে তাঁহারা মৃত দেহ উঠানে নামাইলেন। আমাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে কহিলেন। আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে তাঁহারা আবার আমাকে ঘর হইতে বাহির হইতে বলিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম শুভ্র বস্ত্রে আহামদের মৃতদেহ মণ্ডিত।

তাহার পর আমার নিকট তাঁহারা টাকা চাহিলেন, আঁচল হইতে টাকা খুলিয়া দিলাম। তাঁহারা আল্লার নাম বলিতে বলিতে আহামদকে স্কন্ধে তুলিয়া গৃহশূন্য করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিপুল ব্যথায় আমি মাটীতে শুইয়া পড়িলাম।

*　　*　　*　　*

কখন প্রভাত হইয়াছিল জানি না। যখন সূর্য্যকিরণ আসিয়া মাথায় পড়িয়াছে তখনই জাগিয়া উঠিলাম। চাহিয়া দেখিলাম ঘর শূন্য।

আহামদের জুতা পড়িয়াছিল। তাঁহার জামাটী দেওয়ালে লোহার প্রেকে আবদ্ধ ছিল। বইগুলি অনাথ সতীর মত সেলফে পড়িয়া কাঁদিতেছিল। লিখিবার কলমটী টেবিলের এক পাশে অতি ব্যথায় মৌন হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালা বইয়ের আলমারিটার উপর ধুলা জমিয়া উঠিয়াছিল। বেদনায় দুঃখে বুক ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

তাড়াতাড়ি যাইয়া আহামদের প্রিয় আলমারীগুলি জড়াইয়া ধরিলাম। কিন্তু সেগুলি লোহার মত কঠিন। আঘাত লাগিয়া মাথা কাটিয়া গেল। মেজেয় পড়িয়া গেলাম।

কিন্তু আর উপায় ছিল না। এই ব্যথা ও বেদনা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানিয়া লইতে হইবে। যতক্ষণ তাঁহার মৃতদেহ ছিল ততক্ষণও মন এত খারাপ হয় নাই। দেয়াল, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের একটা মুদ্রিত আঁখি-ছবি, একখানা এক পয়সা দামের দেশী চিরুণী প্রভুর বিরহে নীরবে মর্ম্ম-বেদনার পরিচয় দিতেছিল।

অসহ্য বেদনা! সহিতে পারিতেছিলাম না। কোন পথ দিয়া মুক্ত বিশ্বে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল। উন্মাদিনীর মত তাঁহার জুতা জোড়া জড়াইয়া ধরিলাম। কিন্তু কেহ কোন কথা বলিল না। সকলই মৌন ও মূক হইয়া পড়িয়াছিল।

যখন ১২টা বাজিল তখন শীতল জলে স্নান করিলাম। কিছু আহার করিবার ইচ্ছা ছিল না। রাস্তা হইতে একটু দুধ আনিয়া পান করিলাম।

অতঃপর স্থির করিলাম যত শীঘ্র পারি স্থান পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

আহামদ গৃহের ভাড়া মাসে মাসে পরিষ্কার করিয়া দিতেন, সুতরাং গৃহস্বামী নারায়ণ মহাজনকে শুধু জানাইয়া গেলেই হইবে।

পরক্ষণেই কোথায় যাইব, এই চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িলাম। কে এই পথের মানুষকে একটু স্থান দিবে।

চিন্তায় চিন্তায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে রাত্রি হইল, আমি তখনও চিন্তা করিতেছিলাম—'কোথায় যাইব ?'

একবার ভাবিলাম নিজে নিজে যদি সকলের সহিত দেখা করি তাহা হইলে কাজ জুটিলেও জুটিতে পারে। কিন্তু সামান্য দাসীবৃত্তির জন্য মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতে অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জা বোধ হইতেছিল। একে আমি যুবতী তার উপর আবার গর্ভভারে শক্তিহীনা। যুবতী আমাদের দেশে বিলাসের সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নহে। যাঁহারা সাধু তাঁহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয় বলিয়া যুবতীদিগকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেন, যাহারা অসাধু তাহারা তাহাদের গৌরব চুরি করিতে সদাই ব্যস্ত। গৌরব হারাইয়া রূপ বেচিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি নাই! চাহিলেও তার উপায় ছিল না। আমি তখন অন্তঃসত্ত্বা।

ফ্লোরা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—তাহা হইলে তোমার ইচ্ছা ছিল!

সরলা কহিল—সেই জন্যই ত সর্ব্বদা বুকের কাছে একখানা বড় ছুরি রাখিয়া দিয়াছিলাম।

সরলা কাপড়ের ভিতর হইতে একখানা ছুরি বাহির করিয়া বলিল—এই দেখ বন্ধু সেই ছুরি।

ফ্লোরা চমকিত হইয়া বলিলেন—এই সেই ছুরি! ছোট হইলেও এ যে ভয়ানক ছুরি!

সরলা কহিল, আমরণ ইহা সঙ্গে রাখিব। স্ত্রীলোককে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে ইহার সাহায্য লওয়া আবশ্যক।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

——:*:——

পরদিন প্রাতঃকালে কর্ম্ম অন্বেষণে বাহির হইলাম। কিন্তু এক গুরুতর চিন্তা আমার মনের ভিতর উপস্থিত হইল। জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব ? আমি তখন মুসলমান!

হ্যারিসন রোড দিয়া বরাবর পূর্ব্বদিকে যাইতে লাগিলাম। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিলাম। অত্যধিক বিপদে পড়িয়া তখন হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদ আমার মাথায় স্থান পাইল না। যেখানে কর্ম্ম পাই সেখানেই থাকিব এইরূপ ঠিক করিলাম। বিশ্বাস আমার মনের ভিতর ছিল—কাহারো স্পর্শে ধর্ম্ম নষ্ট হয় ইহা বিশ্বাস করি না। যাহারা এই প্রকার প্রাণশূন্য অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করে তাহাদিগকে আমি ঘৃণা করি।

আমি মুসলমান হইয়াছি বলিয়া হিন্দু যদি আমার হাতের জল খায় তাহা হইলে কেন তাহার জাতি যাইবে ? আমার গা পচিয়া যায় নাই। ভাবিলাম—আমার আত্মার উন্নতি ছাড়া অবনতি হয় নাই। সুতরাং হিন্দু যদি আমার হাতের জল খায়—তাহা হইলে তাহার জাতি যাইবে না।

যে হিন্দু গোপনে অন্ধকারে স্বীয় আত্মাকে অতি জঘন্য পাপের ছুরি দিয়া হত্যা করে, তাহার স্পর্শে আসিয়া হিন্দুর জাতি যায় না, আমার স্পর্শে কেন তাঁহাদের জাতি যাইবে। দ্বিতীয় কথা হিন্দুর কোন অখাদ্য আমি খাই নাই। মহাপুরুষ মোহাম্মদের মহামানবতার উপর বিশ্বাস আনিয়াছি, সমাজের শত কুসংস্কার ও পাপ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছি

বলিয়া কি আমার স্পর্শে হিন্দু ধর্ম্মচ্যুত হইবে! ভাবিলাম কোন হৃদয়বান্ হিন্দু ইহা বিশ্বাস করেন না। বস্তুতঃ বহু হিন্দু মোহাম্মদের মহা মানবতাকে ভক্তির চোখে দেখেন, নিজেদের ভিতরকার বহু প্রথার উপর অত্যন্ত বিরক্ত কিন্তু সমাজের ভয়ে মুখে কিছু বলেন না।

ঠিক করিলাম হিন্দুর বাড়ী হউক বা মুসলমানের বাড়ী হউক যে কোন স্থানে কর্ম্ম খুঁজিব।

সেই বাড়ার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম। কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না।

দরজায় একটা পরদা ঝুলান ছিল। মেয়ে মানুষের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করা তত দোষাবহ নহে ভাবিয়া—পরদা ঠেলিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িতেছিলাম। এটা যে কলিকাতা তা তখন আমার মনে ছিল না।

বাম পার্শ্বে ফটক-ঘরে দারোয়ান বসিয়াছিল। সে বিকট মুখভঙ্গি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কি চাস্?'

আমি কহিলাম—'আমি হিন্দু, কুলীন ব্রাহ্মণ।'

'বাড়ী কোথায়?'

'কলিকাতায়।'

'কোথায় থাক?'

'এই নিকটেই।'

'তবুও কোথায়?'

'এই কাছেই।'

দারোয়ান এত প্রশ্ন করিয়া শেষে বলিল, কোন লোকের দরকার নাই। ফিরিয়া আবার পথে উঠিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া—এক গলীর

ভিতর এক বাড়ীর দরজায় দেখিলাম একটি যুবতী বাহিরের দিকে উকি মারিতেছেন। ভাবিলাম ইঁহার কাছে যাইয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ফল হইতে পারে।

মনের স্বাভাবিক ভাব তখন হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। আমাকে যে এমন করিয়া এক দিন পথে পথে ঘুরিতে হইবে তাহা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম?

যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'মা! এখানে দাসীর দরকার আছে কি?'

যুবতী ঠোঁট টানিয়া অন্যদিকে চাহিয়া বলিল—থাকিতে পারে!

আমি অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিলাম—তাহলে বাড়ীর ভিতর একটু শুনে দেখবেন কি?

যুবতী এতক্ষণে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—তোমার পেটটা এত উঁচু কেন গা।

সেটা এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ী। যুবতী আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। গৃহিণী মিঞার জন্য হুঁকা ঠিক করিয়া রাখিতে-ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই সে যুবতীকে ডাকিয়া কহিলেন—এ মাগী কে রে?

যুবতী কহিলেন—এ কাজ চায়।

গৃহিণী কহিলেন – কাজ কেমন করিয়া করিবে? এর যে নড়িবার ক্ষমতা নাই।

আমি কহিলাম—মা, কর্ম্ম করা তো নয়। একটু আশ্রয় চাই মাত্র।

গৃহিণী কড়া সুরে বলিলেন—আশ্রয় তো সকলেই চায়। কলকাতায় কারেও বিশ্বাস নাই। তোমার বাড়ী কোথায়?

'আমার বাড়ী ঘর নাই, যেখানে থাকি সেইটাই আমার বাড়ী।'

ওমা বাড়ী ঘর নাই! দশ মাসের পেট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমাদের বাড়ীখানি বুঝি ডাক্তারখানা?

'মা, আমি কুলীন হিন্দুর মেয়ে। সবে মুসলমান হয়েছি। আমাকে একটু দয়া দেখান।'

যুবতীর মা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন—ওমা তুমি বামুনের মেয়ে! মুসলমান হয়েছো, দশ মাসের পেট, ঘর দুয়ার নাই! জাত মারতে এসেছ। যাও যাও এখানে স্থান হবে না।

এমন সময় সাহেব আসিলেন এবং আমার দিকে চাহিয়া একটু বিরক্তিমাখা স্বরে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কে?

গৃহিণী মেয়ের উপর দোষ চাপাইয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—কি যেন লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি, পথ থেকে কাকে ডেকে এনেছে। বলে সে ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিল। মুসলমান হয়েছে। পেটের ছিরি দেখে ত বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারখানা কি!

সাহেব গম্ভীরভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—যাও, এখান থেকে চলে যাও!

আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম।

একখানা তিন তলা বাড়ী; রাস্তায় তিন চারি জন যুবক দাঁড়াইয়াছিলেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয়, কাহারো দাসীর দরকার আছে?

একজন হাসিয়া কহিলেন—ঢের, ঢের। দাসীর যথেষ্ট দরকার আছে। দাসী নয়, রাণী চাই। রাণীর চরণে পরাণ মিশিয়ে হইব তাহারি দাস।

আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথা তোমার বাড়ী?

উত্তর দিবার প্রবৃত্তি হইল না, তথাপি কহিলাম—আমি বড় দীনা, আমার কোন গৃহ নাই।

এই কথা বলিয়া আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। পেছন হইতে তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—তুমি বড় ধনী, তুমি মহারাণী, তুমি হে সুন্দরী।

কাপড় মুখে টানিয়া দিলাম, পাছে হতভাগিনীর আঁখিজল কেহ দেখিতে পায়।

কোন্ দিকে যাই, কিছু বুঝিতেছিলাম না। হাতে কয়েকটা মাত্র টাকা ছিল। এগুলি ফুরাইলে কোথায় দাঁড়াইব?

সম্মুখে মহা বিপদ্। শৃগাল কুকুরের দাঁড়াইবার স্থান আছে, স্ত্রীলোকের দাঁড়াইবার স্থান নাই।

রাস্তা দিয়া একটা উড়ে বালক উল্লাসে নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছিল। একটা কাক ডালে বসিয়া 'খা, খা' করিতেছিল। একটা গাড়োয়ান বোঝাই গাড়ীতে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিয়া গাহিয়া গাড়ী হাকাইতেছিল। গোণ্ডারা উচ্চ হাসি হাসিয়া মুখে চুরুট গুজিয়া বুক ফুলাইয়া হাঁটিয়া চলিয়াছিল। উড়ে মেয়েরা সুর টানিয়া টানিয়া যাঁতা ঠেলিতেছিল। যুবকেরা দুর্ব্বলকে পেছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

আমার হৃদয়ে তখন কি ঝড় বহিতেছিল, তার খবর কে রাখে? কত হাজার হাজার মানুষ! যার যার কাজে সেই সেই ব্যস্ত।

ভাবিতেছিলাম—কোথায় আজ আহমদ? আজ যদি তাঁহার সহিত পরিচয় নাও থাকিত, যদি পথে তাঁহার সহিত আমার দেখা হইত, তিনি নিশ্চয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—আপনি কে? আমার ব্যথিত করুণামাখা আঁখি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিভরা স্বরে জানিতে চাহিতেন এমন দুঃখিনীর মত কোথায় আমি যাইতেছি?

মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল—অস্ফুট বেদনার স্বরে বলিয়া উঠিলাম—'কোথায় তুমি আজ। হে দেবতা, হে গুরু! এই বিপুল জনসঙ্ঘের একজনও আমার দিকে ঘৃণা করিয়াও চাহিয়া দেখিতেছে না। এস, একবার আজ এই পাপী দুর্ব্বলা দীনা সহায়হীনা বোন্‌কে রক্ষা কর।

চোখের জল মানুষের দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখিতে যাইয়া এক ড্রেনের ভিতর পড়িয়া গেলাম। মাথায় একটা দারুণ আঘাত লাগিল। আঘাতে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।

অনেকক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হইল তখন শুনিলাম কে যেন ঘণ্টা বাজাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। মাথা তখনও ভাল করিয়া ঠিক হয় নাই। তবুও বুঝিলাম সেটা মন্দির।

ধীরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতায় চোখ বুজিয়া আসিল। সহসা একটি অতি রুক্ষস্বরে, চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম এক মেথর সম্মার্জ্জনী হস্তে আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিতেছে—'কে রে রাণ্ডী তুই? হিয়া কা করতা রাওরা। ভাগ যা হারামী। তোম চোর হায়।' সেখানে গ্যাসের আলো বিশেষ ছিল না। সুতরাং চোর বলিয়া সন্দিগ্ধ হওয়া বিশেষ অসম্ভব নয়।

মেথরের উচ্চ চীৎকারে কয়েকজন মাথা ছোলা ঠাকুর মন্দিরের সম্মুখে বারান্দার সিঁড়ি দিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একজন তিলক কাটিয়া মালা টিপিয়া জপ করিতেছিলেন।

সকলে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল।

একজন ব্রাহ্মণের বেশে দৈত্যের মত কঠিন ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—কে রে মাগী তুই? তুই নিশ্চয়ই চোর। কয়েক দিন হইতে

মন্দির হইতে চুরি হইতেছে। এখানে নিঃশব্দে কোথা হইতে আসিয়া বসিয়া আছিস্? অন্য কাহারো ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলি কি?

কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। তাহাদের নিষ্ঠুর মুখের দিকে ভাষাহীন হয়ে চেয়ে রইলাম মাত্র। তাহাদের সন্দেহ আরও বৰ্দ্ধিত হইল।

আর একজন বলিলেন—পুলিশ ডাক, পুলিশ ডাক। চোর যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন আর কেন? মাগীকে ধর, পালাইতে পারে!

আর একজন বলিলেন—একটা লাথি লাগাও শালীকে।

অতি কষ্টে বলিলাম, বাবু আমি চোর নহি। আমি ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্ব্বলতায় এখানে পড়িয়া গিয়াছিলাম।

কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভয়ে এক পা দুই পা করিয়া সরিয়া পড়িতেছিলাম।

একটু দূরে আসিয়াছি এমন সময় ঠাকুরের ভৃত্য বলিল, মাগীর মুখে মদের গন্ধ। মাগী মদ খেয়ে ওখানে পড়েছিলো।

অতি কষ্টে সে মূত্র ময়লা মাখান কাপড় লইয়া রাত্রি প্রায় নয়টার সময় বাসায় আসিয়া স্নান করিলাম।

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

সে রাত্রি চলিয়া গেল। কিন্তু আমার দুঃখের ভার লইয়া গেল না। নূতন সূর্য্যের আলোতে পৃথিবী সুন্দরীর মত আমার আঁধার হৃদয় হাসিয়া উঠিল না। সঙ্গে মাত্র ১৫টী টাকা। ভাবিলাম পরের বাসায় কয় দিন থাকিব? প্রভাতে উঠিয়াই স্নান করিয়া উপাসনা শেষ করিলাম। আবার দারুণ চিন্তা। কোথায় যাইব? ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমার জন্য কোন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন. কিন্তু কোথায়? আমাকে তো খুঁজিয়া লইতে হইবে।

সাধারণ মানুষের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছিলাম। ধার্ম্মিক হইলেও তাহারা হৃদয়হীন। হৃদয়হীনের আবার ধর্ম্ম কি?

চিন্তা করিতে লাগিলাম—দেশের শাসনকর্ত্তা দেশের পিতা। পিতার মতই তার হৃদয় স্নেহময়। আমি দরিদ্রা হইতে পারি কিন্তু তাই বলিয়া কি পিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিতা হইব? নিশ্চয়ই নহে। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নমস্কার করিলাম। তাঁহারি স্নেহ শত ভাবে নানা কর্ম্মে প্রতিফলিত হইয়া আমাকে পালন করিতেছিল।

আজ কিন্তু আমার জন্য একটু বেশী স্নেহ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। একটু স্থান চাই। দুটি অন্ন চাই। শুধু দেশের সাধারণ শান্তি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

সম্রাট্ হারুণ-অল-রশিদের কথা মনে হইল। সেই মহামানুষ কোন্

অতীত যুগে, কোথায় কোন আঁধার ঘরে কে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে দেখিয়া বেড়াইতেছেন।

আহামদের মুখে মহাপুরুষ ওমরের পুণ্য কথা শুনিয়াছিলাম। ভারে ভারে মণিমুক্তা দেশ বিদেশ হইতে আসিতেছে, তিনি ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছেন। সামান্য দীন দরিদ্র তাঁহার কাছে দুঃখ কাহিনী নিবেদন করিতে ভয় পাইত না। লক্ষ পীড়িত দরিদ্র মানুষের কথা ভাবিয়া তিনি বিলাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গাছের তলা ছিল তাঁর প্রাসাদ, তৃণশয্যা ছিল তাঁর বাদসাহী গদি। অতঃপর সাহসে বুক বাঁধিয়া চৌরঙ্গী ধরিয়া আমি রাজপ্রাসাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দূর হইতে রাজাকে উদ্দেশ করিয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রেমে মাথা অবনত করিলাম। গগনচুম্বী প্রাসাদ সম্মুখে সঙ্গীন হস্তে পাহারাদার-দের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে আমি পালাইয়া আসিলাম। আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। আমার মত ক্ষুদ্র রমণীর পিতা তিনি, একথা চিন্তা করিতে ভীত হইলাম। এমন কি, ভাবিতেছিলাম বাতাস বুঝি আমার কল্পনা ভাষায় গাঁথিয়া সকলকে বলিয়া দিবে এবং অবমাননার জন্য আমার ফাঁসি হইবে। তখন মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

দেশের এক গণ্যমান্য লোকের কথা শুনিয়াছিলাম। শাসনকার্য্যে তিনি গভর্ণমেণ্টকে সহায়তা করেন। তিনি একজন দার্শনিক বাগ্মী এবং সমাজ-সেবক। এই মহাত্মার কথা মনে হওয়া মাত্র হৃদয়ে বিপুল সাহস ও বলের সঞ্চার হইল; এই দেশের বীরের কথা চিন্তা করিয়া হৃদয়ে নূতন বল ও আশা অনুভব করিলাম। নিজকে ধিক্কার প্রদান করিলাম কেন পথ ভুলিয়া বিপথে গমন করিয়াছিলাম!

বিশ্বাস হইল—দেশের এই স্নেহময় পিতার কাছে গেলে নিশ্চয়ই

কোন ব্যবস্থা হইবে। তিনি হয়ত দেশের শত শত পীড়িত ও দরিদ্র মানুষের চিন্তায়, অনিদ্রায় দিনের পর দিন কাটাইয়া দেন। নইলে এই ভয়ানক কার্য্যভার তিনি গ্রহণ করিবেন কেন? হয়ত আহারের সময় হস্ত তাঁহার কাঁপিয়া উঠে, কারণ দেশের কত মানুষ না খাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দেয়। তিনি সহজ ও শান্ত ভাবে নিশ্বাস লইতে ভীত হয়েন।

কৃতজ্ঞতায় চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

আবার ভাবিতে লাগিলাম—তিনি হয় ত তৃণশয্যায় শয়ন করেন। পিতা সন্তানকে মাটীতে ফেলিয়া মখমলমণ্ডিত শয্যায় কি শুইতে পারেন? অট্টালিকায় বাস করিলেও তিনি শয়ন করেন মাটিতে। তাঁহার হৃদয় কত পবিত্র, কত মহান্, তাহা সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া বুঝিবে?

পথ হইতেই সেই মহাপুরুষের বাড়ীর দিকে চলিলাম। হৃদয় তখন উৎসাহে ভরা। যাঁহার কথা বলিতেছিলাম—তাঁহার নাম ব্যারিষ্টার জীবনকুমার রায়। তিনি সমস্ত ইউরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। কলিকাতার পূর্ব্বদিকে তাঁর বাসা।

এত বিশ্বাস ও উৎসাহ সত্ত্বেও গন্তব্য স্থানের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই মনে একটা অনির্দ্দিষ্ট সন্দেহ ও সঙ্কোচ আসিয়া জমা হইতেছিল।

সম্মুখেই সেই প্রকাণ্ড বাড়ী, কত গাড়ী তখন সেই পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল।

অজ্ঞাতসারে আবার ভাবিতেছিলাম—আমি বড় ছোট। আমি পথের ভিখারিণী মাত্র। সেই মহাপুরুষ কি আমার ন্যায় ক্ষুদ্রের কাতর কথা শুনিবার জন্য পথে দাঁড়াইয়া আছেন? আমার কাছে তো কোন রাজনৈতিক কথা নাই! আমি তো কোন দেশের মহারাণী নই!

আমার কাছে তো দেশ বিদেশের খবর নাই! আমি তো কোন ধনী সওদাগর নহি! তুচ্ছ ভিখারিণী মাত্র! এ আমার অন্যায় বাড়াবাড়ি! আমি হেয়—পথের কাঙ্গালিনী! গায়ে আমার মলিন বসন। বিধাতাও বোধ হয় আমার মত ক্ষুদ্রকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার পবিত্র হস্ত অপবিত্র করেন নাই।

নিজের দীনতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম।

কত লোক, কত সাহেব নানা বসনে সজ্জিত হইয়া আসা যাওয়া করিতেছিলেন।

সেই প্রাসাদতুল্য সৌধের কাছে যাইয়া দাঁড়াইলাম। গেটের কাছে দারোয়ান আর তার কয়েকটি এয়ার কলিকা টানিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইতে সাহস করিলাম না। সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলাম।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সেখানে সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সহসা হৃদয়ে অনুতাপ অনুভব করিলাম। প্রাণের এত আশা ও বিশ্বাস কোথায় গেল? আমি নিতান্ত কাপুরুষ। মানুষকে দুঃখ না জানাইলে কেমন করিয়া তাহারা আমার দুঃখ বুঝিবে?

সাহসে ভর করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলাম। এমন সময় পেছন হইতে দারোয়ানের লৌহ হস্ত আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল।

দারোয়ান গম্ভীর বদনে বলিল—"কা মাঙ্গতা?

'বাবু' বলিতে ভয় হয়। 'সাহেবের' সহিত দেখা করিতে চাই উহাও বলিতে আমার সাহস হইল না। উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দারোয়ান পুনরায় উগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কা মাঙ্গতা?'

রাগ হইতেছিল। বাধা না মানিয়াই অগ্রসর হইতেছিলাম; কিন্তু সে দুই হাত দিয়া ধাক্কা মারিতে মারিতে আমাকে ফটকের বাহির করিয়া দিল।

কি করিব? ফিরিয়া যাইতেছিলাম। দূর হইতে শুনিলাম—কে গম্ভীর স্বরে বলিতেছিলেন—'কাহে বাহার কা আদমি আনে দেতা হায় শূয়ার?'

আর এক জন বলিতেছিল—বহুত খাতা হুয়া হুজুর!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সরলা তার পর কহিলেন—সমস্ত আশা তখন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তবুও মনে মনে ভাবিতেছিলাম—ভগবান্ কি আমাকে পথে পড়িয়া মরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কখনই তা হতে পারে না। ভাবিলাম—শুধু দুঃখের জন্যই সংসার? কত দুর্ব্বৃত্ত সোণার সিংহাসনে বসিয়া আছে, আর আমি না খাইয়া মরিয়া যাইব? বিধাতা কি নাই? নিশ্চয়ই আছেন। তিনি দয়াময়। তিনি পিতা হইতেও অতি আপনার।

পৃথিবীর সকল মানুষকে দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আহামদ কি এই পৃথিবীর মানুষই ছিলেন না? তিনি পৃথিবীর মানুষ হইয়াও পৃথিবীর অন্যায় ও পাপের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই। পৃথিবীর যেটুকু স্বর্গ সেইটুকুর আলো বাতাস খেয়ে তিনি বেঁচে থাকিতেন। সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি উহার মাথায় পদাঘাত করিয়া মহাকাশে মিশিয়া গিয়াছেন। ঘৃণিত সংসারের চাপ মাথায় পড়িলে কি

মানুষ এত ধৈর্য্যহীন হয় কি, তাহারা কি ভুলিয়া যায়—এ সংসারে সহস্র পিতা, মানুষের কোটি জননী, অসংখ্য সন্তান, মানুষের প্রাণ লইয়া, রক্ত মাংসের শরীর ধরিয়া তাহাদেরই মত বাঁচিয়া আছে। নিজের মায়ের বুকের আঘাত যেমন ক্লেশ কর, অপরের মায়ের বুকের আঘাতও তেমনি পীড়া-দায়ক। নিজের সন্তান ব্যথায় যেমন কাঁদিয়া উঠে, অন্যের সন্তানও তেমনি কাঁদিতে জানে। তৃষ্ণায় যেমন আমার কণ্ঠ ফাটিয়া উঠে, অন্যের কণ্ঠও গ্রীষ্মতাপে তেমনি শুকাইয়া উঠে! প্রিয়তমার মুখ যেমন নিজের কাছে ভাল লাগে, দীন দুঃখীর প্রিয়তমাও তার কাছে তেমনি মধুর। মানুষ কেন তবে নিজের সুখের জন্য এত লালায়িত? কেমন করিয়া যথার্থ মাতৃভক্ত অন্যের মাতাকে অপমান করিতে সাহস করে? কেমন করিয়া পিতৃভক্ত অন্যের পিতার বুকে অত্যাচারের আগুন জ্বালাইয়া দেয়? সন্তানকে যে যথার্থই ভালবাসে, সে কেমন করিয়া পরের সন্তানের গলা টিপিয়া মারে? যে প্রিয়তমার মুখে সুধার সন্ধান পায়—সে কেমন করিয়া সতীর বুকে আগুন জ্বালিয়া দেয়?

আহামদ যুবক ছিলেন। ভাবিলাম—যুবকেরা সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন না। তাঁহারা নিশ্চয়ই সংসারে মানুষের মত হৃদয়হীন নহেন। তাঁহাদের পুণ্যবলেই সংসার টিকিয়া আছে।

মনে আবার একটা ক্ষীণ আশার রেখা ফুটিয়া উঠিল। স্বীয় দীনতার উপর ধীরে ধীরে যেন আবার একটা অবিশ্বাস জাগিয়া উঠিল।

ভাবিলাম কলিকাতায় অনেক দেশের যুবক আসিয়া বড় বড় ছাত্রাবাসে পাঠ অভ্যাস করেন। তাঁহাদের কাছে আমার দুঃখের কথা নিবেদন করিলে নিশ্চয়ই ফল হইতে পারে। এই বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে লাগিল।

ভাবিলাম তাঁহারা মহা মহা ঋষিদের পুস্তক পাঠ করেন। তাঁহারা কত দর্শনের কথা আলোচনা করেন। বেদনা কাহাকে কহে? ধর্ম্ম কি? মানুষের হৃদয় জিনিসটা কি? এই সব বুঝিবার জন্য তাঁরা কত বৎসর কাটাইয়া দেন। কত দেশের কথা—কত শোকাবহ করুণ কাহিনী তাঁহারা পাঠ করেন। কেমন করিয়া দেশের আর্থিক অবস্থা ভাল হয়, অত্যাচারের ফলে কত সমাজ ধরণী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সব কণ্ঠস্থ করিয়াই তাঁহারা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন।

আমি একটা সহায়শূন্যা রমণী, আমার কেউ নাই—একটু সাহায্য না পেলে আমি মরে যাবো। এই সামান্য কথা তাঁরা বুঝবেন না।

মনে মনে লজ্জিতা হইলাম। ভাবিলাম কেন আমার এই সহস্র ভাইদের কথা এত আগে মনে হয় নাই। তাহা হইলে তো এত কষ্ট পাইতাম না।

যথাসময়ে কড়েয়ার কাছে এক প্রকাণ্ড ছাত্রাবাসে গিয়াছিলাম। প্রতিদান পাইয়াছিলাম অপমান ও প্রহার। যে যুবক আমাকে অপমান করিয়াছিল তাহার পৈশাচিক উপহাস এখনও আমার অন্তরে বিষ ঢালিয়া দেয়।

——

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

ঐর পর পাঁচ ছয় দিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

আহামদের সহিত রাণাঘাটের এক হিন্দু ভদ্রলোকের অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। শুনিয়াছিলাম তিনি একজন কবি। আহামদ প্রায়ই এই ভদ্রলোকের প্রশংসা করিতেন। ইঁহার নাম ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। আহামদ বলিতেন, ইনি মুসলমান জাতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। পথে দাঁড়াইবার আগে, মুক্ত পৃথিবীকে গৃহ করিয়া লইবার পূর্ব্বে একবার এই ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হইল। পৃথিবীকে একটা বিরাট্ সমাধিক্ষেত্র বলিয়া মনে হইতেছিল। যেন কোথাও একটা জীবন্ত মানুষ, একটু মায়া, একটু স্নেহ নাই।

এই ভদ্রলোকের বাড়ী রাণাঘাটে।

পরদিন প্রত্যূষে, গাত্রোত্থান করিয়াই স্নান ও উপাসনা শেষ করিলাম, এবং দরজা বন্ধ করিয়া ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

টিকিট ক্রয় করা কত ভয়ানক ব্যাপার, তাহা বঙ্গদেশের লোকেই জানে; তুমি হয় ত আমার কথা শুনিয়া হাসিবে!

ফ্লোরা কহিলেন—কেন?

সরলা বলিল,—"তোমরা সাহেব, তোমরা সব সময়েই দ্বিতীয় অথবা প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় কর। বাঙ্গালীকে কত কষ্ট পাইতে হয় তাহা ভগবান্ জানেন। আর যাহারা টিকিট ক্রয় করে তাহারাই জানে।"

"কেন? দেশের মানুষ দেশের মানুষের কাছে অসুবিধা ভোগ করে। বড় বিস্ময়ের কথা ত!"

সরলা হাসিয়া কহিল, "তুমি জান না, বাঙ্গালী দেশের মানুষ অপেক্ষা বিদেশী মানুষকে বেশী ভালবাসে। দেশের মানুষের অসুবিধা অপেক্ষা বিদেশী মানুষের অসুবিধার পানে বেশী তাকায়, নিজের মাকে মা না বলিয়া পরের মাকে মা বলিয়া ডাকিতে তারা বেশী মজবুত।

ষ্টেশনে টিকিট ক্রয় করিলাম। যত সহজে তুমি মনে করিতেছ তত সহজে নহে। জীবনের ছোট ছোট কথা শুনিয়া তোমার কাজ নাই। অনেক যন্ত্রণা, বিড়ম্বনার কথা বলিয়াছি। বেশী বলিবার প্রবৃত্তি নাই। রেলওয়ে, ষ্টীমারে আমাদের দেশে সাধারণতঃ অল্প শিক্ষিত লোক কাজ করে। তাহারা ভদ্রতা বলিয়া কোন কিছু জানে না। অশিক্ষিত লোকের হস্তে ক্ষমতা দিলে যাহা ঘটে, ষ্টেশনেও তাহাই ঘটে। এই সব কর্ম্মচারীরা অসঙ্কোচে অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও নানা অকথ্য কথা বলিতে লজ্জা বোধ করে না। ইহাদের কথা, ব্যবহার ও কাজ অত্যন্ত ঘৃণিত; তবে সর্ব্বত্র এ নিয়ম নহে, অনেক ভদ্রলোক আছেন—অনেক ভদ্র ঘরের ছেলেও রেলওয়ে কাজ করেন, তাঁহাদের ব্যবহার নিতান্ত মন্দ নহে।

ফ্লোরা কহিল, "ষ্টেশনে, গাড়ীতে, ষ্টীমারে মানুষের সহিত যত ভদ্রতা দেখান আবশ্যক এত আর অন্য কোন স্থানে না দেখাইলেও চলে। গৃহের আধিপত্য লইয়া ভ্রমণ করা অসম্ভব। বাড়ীতে রাজা হইলেও পথে তিনি কিছুই নহেন। এ অবস্থায় কাহারো প্রতি অভদ্র ব্যবহার করা কাপুরুষের কাজ। আমাদের ইংলণ্ডে বা আয়ার্লণ্ডে ত এমন নহে। কি রেলওয়ে, কি ষ্টীমারে সর্ব্বত্রই কর্ম্মচারীদের ব্যবহার অতি সুন্দর।

প্রয়োজন হইলে ভদ্রমহিলা ও বৃদ্ধদিগের ভ্রমণের সুবিধার জন্য তাঁহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করেন।

সরলা হাসিয়া কহিল—"এটা আয়ার্লণ্ড নয় বা বিলেত নহে। এখানে কর্ম্মচারীরা ভদ্রমহিলাদিগকে গাড়ীতে সুবিধা করিয়া দিবার পরিবর্ত্তে অনেক সময় খালী বাসায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করে! অবশ্য অনেক কর্ম্মচারী অনেক ক্ষেত্রে সাধুতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন ইহা আমি অস্বীকার করি না। গভর্ণমেণ্ট এই সব বদমাইশ কর্ম্মচারীর সংবাদ পাইলে শাস্তির ব্যবস্থা করেন সত্য, কিন্তু অপমানিত হইয়া আততায়ীকে শাস্তি দিলেও কি সে অপমান-যন্ত্রণা বিদূরিত হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা-গাড়ীতে চড়িয়া যথাসময়ে রাণাঘাটে নামিলাম। ষ্টেশনের অন্য পার্শ্বে পাল্কী ছিল। বেহারাদের কাছে যাইয়া কবির নাম করিয়া, তাঁহার বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। বেহারারা কবির নাম শুনিয়া যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

আট আনা বন্দোবস্ত করিলাম। ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে কবির বাড়ী।

কোন চিন্তা করিতেছিলাম না। ব্যর্থতায়, বেদনায়—আমার হৃদয় শক্ত হইয়া গিয়াছিল।

অনেকক্ষণ পরে জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম একখানি ছোট খড়ের ঘরের সম্মুখে আসিয়াছি। একখানা বারাণ্ডার সম্মুখে—সিঁড়ির দুই পার্শ্বে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটী বাগান; ছোট ছোট ফুলের গাছে, এবং সবুজ লতায় শোভাযুক্ত। এক ব্যক্তি একটা এস্‌রাজ স্কন্ধে ফেলিয়া, ধীরে ধীরে তারে ঘা দিতেছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর ও পবিত্র ভাবমাখান। মুখে আবক্ষ-লম্বিত কৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি—ঠিক যেন দরবেশের মত। বেহারারাও ঠিক সেই

বাড়ীর দিকেই চলিল। যতই নিকটে যাইতে লাগিলাম ততই তাঁহাকে স্পষ্ট ভাবে দেখিতে লাগিলাম। একখানা কম্বলে তিনি বসিয়াছিলেন। চেয়ার বা টেবিল কিছু ছিল না। কম্বলের একপার্শ্বে কয়েকখানা খাতা-পত্র। একটা দোয়াত এবং কয়েকটা কলম।

সেই দেশবিখ্যাত কবির দরজায় যাইয়া অজ্ঞাতসারে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলাম। কড়েয়ার বোর্ডিং ঘরে প্রবেশ করিবার সময় যেন কেমন একটু বোধ হইয়াছিল—মুখে কথাটী আসিতেছিল না। কবির বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া আমার কোন ভয় হইল না—জানি না ফে্ারা, কেন ?

আর যাইতেছিলামও দীন ভিখারীর কাছে। ভিখারীর কাছে আবার ভয় কি ?

অমি দূর হইতে শুনিলাম—তিনি মৃদু স্বরে মহাকবি হাফেজের একটী গান গাহিতেছেন :—

তোমার বেদনা উথলি উঠিছে—
আমার পরাণ ছানিয়ে
তোমার মমতা, ভাসিয়া উঠুক—
ব্যথায় হৃদয় মোহিয়ে।
ব্যথার পসরা ভাষাহীন ভাবে—
উঠুক পরাণে জাগিয়ে
আমি দীন হয়ে প্রভু-রাজা হয়ে উঠি
তোমার গরিমা লভিয়ে।

এটা যে হাফেজের কবিতা তা অনেক পরে বুঝিয়াছি। বেহারারা পাল্কী নামাইয়া কবিকে প্রণাম করিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল ইনিই ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। দরজা খুলিয়া নামিয়াই অসঙ্কোচে বলিয়া গেলাম

'আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি, আপনার সহিত দেখা করিব বলিয়া।'

সেখানে লোকজন ছিল না। দরজায় নহবৎ ছিল না। অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া কবির প্রাঙ্গণকে গৌরবময় করিয়া তুলে নাই! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চাপরাশী, নায়েব, গোমস্তা, বরকন্দাজ আসিয়া তাঁহাকে সেলাম—দিতেছিল না। আমি ছায়ার লতা-মণ্ডপতলে এক পার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া কথা বলিতেছিলাম।

একটু থামিয়া আবার কহিলাম,—আমি অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্তা। জনৈক পীড়িত আত্মীয়ের সহিত কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। তিনি আমাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় করিয়া আজ কয়েকদিন হইল—মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আমি কিছুকাল হইল বিধবা হইয়াছি। আমার সংসারে আর কেহই নাই। যিনি মরিয়া গিয়াছেন, তিনি আমার চাচার ছেলে। যাহা কিছু ছিল সব ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখন আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়;—আমি এখন পথের ভিখারিণী।

কবি বসিয়াছিলেন, লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার এস্রাজটী ধাক্কা লাগিয়া বারাণ্ডা হইতে নীচে পড়িয়া গেল, দোয়াত পায়ের আঘাতে একেবারে কম্বলটীকে কালিময় করিয়া ফেলিল। কবির সে দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

যেন দুনিয়ার সমস্ত মমতা কণ্ঠে মিলাইয়া কবি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওগো! শুনেছ, আজ তোমার দরজায় দয়া করে দীন বেশে মহাপুরুষ মোহাম্মদের এক কন্যা এসেছেন।'

তাহার পর আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,—বাছা, আজ আমার সুপ্রভাত। এমন করিয়া কেউ ত আমার প্রতি এ যাবৎ পর্য্যন্ত

অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। আমি সামান্য দীন ভিখারী, আমার কাছে আপনি অনুগ্রহ করে এসেছেন, এর জন্য খোদাকে সহস্র ধন্যবাদ দিচ্ছি।

এমন সময় এক প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া নয়নে আনন্দ মাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে এসেছেন?'

কবি সকল কথা গৃহিণীকে জানাইলেন। কবি-গৃহিণীর নয়ন যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি কি হইয়া গেলাম, বলিতে পারি না!

যাহা কখনও আশা করি নাই,—যাহা মানুষের দুয়ারে সম্ভবে না, তাহাই দেখিলাম। আমার চর্ম্মচক্ষু পবিত্র হইল।

কবি-কন্যা অমলা অষ্টাদশ বর্ষীয়া, এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। অমলা আমাকে ডাকিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অতঃপর অবিলম্বে আমার আহারের ব্যবস্থা হইল। আমি যেন তাঁহাদের কত কালের আত্মীয়, যেন কতকালের পরিচিত বন্ধুটী। অমলা আমার রাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সে নূতন হাঁড়িতে জল ঢালিয়া দিল, তরকারী কুটিয়া দিল, এবং প্রয়োজন হইলে ভাত ঘুটিয়া দিল। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—অমলা, তোমার ব্যবহারে মনে হইতেছে তুমি কোনও রকম মানামানি কর না।

অমলা কহিল—আমরা ব্রাহ্মণ। মানামানির ধার ধারি না। মানামানির মধ্যে ধর্ম্ম নাই—এ কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। অসভ্য লোক বা ইতর নোংরা লোককে হিন্দুর যেরূপ ঘৃণা করিবার অধিকার আছে, মুসলমানেরও তেমনি আছে। ভদ্র হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এরূপ ছোঁয়া-ছুঁয়ির দোষ থাকা নিতান্তই পৈশাচিক। হিন্দু অতিভদ্র মুসলমানকেও এই ঘৃণিত ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপারে দারুণ আঘাত দিয়া থাকেন, ইহা কত ভয়ানক তাহা বলা যায় না। মুসলমানেরাও যদি হিন্দুর প্রতি ঠিক এই প্রকার ব্যবহার করা আরম্ভ করেন, তাহা হইলে ব্যাপারটা কত বিরক্তি কর, মর্ম্মপীড়ক ও উভয়ের জন্য ক্ষতিজনক হইয়া দাঁড়ায়—তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া উঠা কঠিন। খাদ্য অখাদ্য সম্বন্ধে একজন অন্য জনের ভদ্রতার উপর নির্ভর করিলেই চলে। অপমানিত হওয়া অপেক্ষা অপমান করাই অধিক লজ্জাজনক, ইহা হিন্দুরা কবে বুঝিবেন তাহা বলা যায় না।

অমলার কথার পরে বুঝিলাম সে বেথুন কলেজিয়েট বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেনতে পড়ে, সুতরাং এ সব কথা তাহার মুখে বেশ মানায়। আমি বিস্মিত হইয়া রাঁধিতে রাঁধিতে তাহার সহিত অনেক বিষয়ের আলোচনা করিলাম, সে বিচক্ষণ বিদূষীর মত সমস্ত কথার উত্তর দিল।

রাঁধা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এমন সময় কবি ও কবি-প্রিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর। দক্ষিণ পার্শ্বে একটা এক তালা দালান। দালানটী খুব লম্বা। বাড়ীতে বেশী লোকজন নাই, সর্ব্বদা যেন একটা প্রশান্ত নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। দাসীর বাড়াবাড়ি দেখিলাম না, মাত্র একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এদিক্ ওদিক্ কাজ করিয়া বেড়াইতেছিল। ঝি মাত্র দুটী কথা আমার সহিত বলিয়াছিল

দেখিলাম কবি-পরিবারের মত তাহার কথা নম্র ও মধুর। প্রকৃত মানুষের কাছে থাকিলে নিতান্ত পশুও এমনি করিয়া ভাল হইয়া উঠে।

দালানের এক পার্শ্বে আমার রাঁধিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কবি-প্রিয়া এক ঘটি দুধ আমার ঘরের মধ্যে আসিয়াই রাখিয়া গেলেন। অমলা তখন আমার ভাত দেখিতেছিল। আমি এই উদার ব্যবহারে মুগ্ধ হইলাম। ধর্ম্ম যদি থাকে তবে সেই সব স্থানেই আছে। ধর্ম্ম জ্ঞানে, স্নেহে ও প্রেমে ; ঘৃণা, নীচতা, কুসংস্কারের ত্রিসীমাতেও ধর্ম্ম আসে না।

কবি বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিলেন—"মা, আপনি কোনও প্রকার সঙ্কোচ অনুভব করিবেন না।

ব্রাহ্মেরা কুসংস্কারের ধার ধারে না। আমরা মহাপুরুষ মোহাম্মদকে সম্মানের চোখে দেখি। মুসলমানের কোরাণকে আমরা মহাগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করি। খোদা যে আপনাকে আমার কাছে আনিয়া দিয়াছেন ইহার জন্য আমি তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। আহা, আপনি কতই না কষ্ট পাইয়াছেন!" আমি নিরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলাম। তিনি আবার কহিতে লাগিলেন,—"আপনি খাইয়া একটু বিশ্রাম করুন। সন্ধ্যাকালে যাহাতে আপনার সকল প্রকার সুবিধা হয় সে ব্যবস্থা করিব। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।"

সন্ধ্যা হইল—কবি পিতার মত আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মা আপনি কেমন আছেন?'

আমি লজ্জায় মরিয়া কহিলাম,—ভাল আছি, আমার বড় ভয় হইতেছে, আপনাদিগকে বড় কষ্ট দিতেছি।

তিনি কহিলেন, 'বল কি মা! আমার কষ্ট হইতেছে? ইহাতেই আমাদের আনন্দ। তোমার মত কত শত রমনী নিঃসহায় হইয়া দেশে

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের পিতা নাই, মাতা নাই, কেহ নাই; কর্ম্ম করিবার কোন ক্ষমতা নাই। তুমি আমার কাছে আসিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছ। তোমার থাকিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিব, এবং তাহার পর উপস্থিত বিপদ্ কাটিয়া গেলে তুমি যাহাতে তোমার দেশে ফিরিয়া যাইতে পার তাহার ব্যবস্থা করিব। তোমার মত অসহায়া মানুষকে যদি সমস্ত জীবন প্রতিপালন করিতে পারি তাহাতেও আমার সুখ ছাড়া দুঃখ হইবে না।'

আমি কহিলাম, 'অমি কল্য প্রভাতে যাইয়া, কলিকাতার বাসায় যাহা কিছু আছে, লইয়া আসিতে চাই।'

কবি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—সঙ্গে প্রয়োজন হইলে অমলাকে লইয়া যাইও।

আমি কহিলাম, 'না তাঁহাকে আর কষ্ট দিতে চাহি না, আমি নিজেই পরশু সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিব।'

এমন সময় শুনিলাম কে যেন বাহিরে কাঁদিতেছে। ললিতবাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন। শুনিলাম বাহিরে কে যেন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছে,—"বাবু আজ আমার বড় ছেলেটী মারা গিয়াছে। ঘরে একটী পয়সাও নাই।"

ললিতবাবু তাহাকে অতি কাতর স্বরে বলিলেন,—জহর, কাঁদিও না। তোমাকে আমি কয়েকটী টাকা দিতেছি। তুমি উহা লইয়া উপস্থিত ব্যয়ভার বহন কর।

আমি অবাক্ হইয়া অমলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'অমলা! বাবু এমন করিয়া দান করিলে আপনাদের সংসার কেমন করিয়া চলে?

অমলা কহিল,—বাবা যাহা কিছু উপায় করেন মানুষকে বিলাইয়া দেন। কিছু ভূসম্পত্তি আছে এবং পুস্তক হইতে কিছু আয় হয়।

আমি খাইতে বসিলে অমলা আমার নিষেধ সত্ত্বেও ভাত বাড়িয়া দিল। গরম দুধটুকু ঠাণ্ডা জলের মধ্যে রাখিয়া ঘর হইতে চারিখানি সন্দেশ আনিল। অমলার মাতা দরজার অন্য পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমাকে ধীর ও স্থির চিত্তে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন। আমি কত কষ্টে কত দুর্ভাবনায় এ কয় দিন কাটাইয়াছি, এ কয় দিন হয়ত পেটে আমার অন্ন পড়ে নাই বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। আমি কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে কথা কহিতে পারিতেছিলাম না।

নানা কথায় শেষ বেলাটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার একটু আগে পিয়ন আসিয়া বাবু বাবু বলিয়া চিৎকার করিতেছিল। অমলা বাহিরে গিয়া পিয়নকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে নমস্কার করিয়া একখানা ভি পি মনিঅর্ডার অমলার হস্তে প্রদান করিল। ললিত বাবু নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি অমলার সহিত বাহিরে গিয়া তাহার পিয়নের সহিত কথা বলিবার ভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিলাম। মেয়েমানুষের জড়তা তাহার মধ্যে আদৌ দেখিলাম না। দিব্যি পুরুষ ছেলেটীর মত সে হাত বাড়াইয়া ফরম খানার উপর খচ্‌খচ্‌ করিয়া লিখিয়া দিল—অমলা ভি, পি এবং পনরটি টাকা গণিয়া লইল। সে টাকাগুলি বাজাইয়া লইতে পর্য্যন্ত ছাড়িল না। আমি অবাক্। অমলার সহিত নিজেকে তুলনা করিলাম। সে দশটী পুরুষকে চা বাগানে বেচিয়া আসিতে পারে আর আমি গর্দ্দভ—জড়পিণ্ড—পরমুখাপেক্ষী—চলিতে চরণ কাঁপে—লজ্জায় মরিয়া যাই—ঘরের এক কোণে অশ্রু ফেলিয়া বক্ষঃ ভিজাই, পরে দয়া না করিলে আমার বাঁচিবার ক্ষমতা নাই। কি অপদার্থ আমি!

ভাবিলাম কেন আমি এত অপদার্থ? কে আমাকে এমন জড়পিণ্ড করিয়াছে? আমার জীবন কি পরের অনুগ্রহের উপর? আমার কি হাত নাই পা নাই? আমি কি মানুষ নই? আমি পশু? মানুষের হাতের কাঠি!

অমলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ টাকা কোথা হইতে আসিল?

অমলা কহিল—বাবার পুস্তকের টাকা। তিনি খবরের কাগজে আমার নামে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। মফস্বল হইতে আমার কাছে চিঠি আসে। আমি নিজেই সকলের নিকট বই পাঠাই।

অতঃপর সে আমার আঁচল ধরিয়া উঠানে টানিয়া আনিল। আমাকে হাস্যময়ী ও চঞ্চলা করিবার জন্য সে কথা বলিতেছিল। বাসার মধ্যে এক ধারে একটিক্ষুদ্র বাগান। অমলা কোদাল লইয়া মাটী কোপাইতে আরম্ভ করিল। এমন সময় অমলার মাতা আসিয়া কহিলেন—মাটী কোপান বেশ হইয়াছে। জালা হইতে জল লইয়া গাছের তলায় দাও অমনি এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া অমলা মাজায় কাপড় বাঁধিয়া লইল এবং এক বৃহৎ কলস লইয়া বীর রমণীর ন্যায় গাছে গাছে জল দেওয়া আরম্ভ করিল। আমিত অবাক্। রাত্রে এক যায়গায় শুইয়া থাকিলাম। কেমন করিয়া বিনা-আড়ম্বরে ও বিনা-ভূমিকায় তাঁহারা আমাকে এত অল্প সময়ে এত আপনার করিয়া লইলেন তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি না।

পরদিন প্রভাতে ললিত বাবু আমার বেহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কছে রিটার্ণ টিকিট ছিল তত্রাচ অমলা আমার হাতের ভিতর টিকিটের পয়সা গুজিয়া দিতে ছাড়িল না। আমি পর দিন সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিব বলিয়া কবির পবিত্র ভবন ত্যাগ করিলাম। অমলা গেটের পার্শ্বে

চোখে হাসি মাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি জানালার ফাঁকদিয়া দূর হইতে আর একবার তাহার উজ্জল মুখখানি দেখিয়া লইলাম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুপুর বেলা বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। বৈকাল বেলা পেটে একটু বেদনা বোধ হইতে লাগিল। ভয়ে আমার মুখ শুকাইয়া গেল। প্রাণ পণে খোদাকে ডাকিতে লাগিলাম।

যাহা কিছু লইবার দরকার ঠিকঠাক করিতে আরম্ভ করিলাম; মনে করিলাম বিলম্ব না করিয়া প্রাতঃকালেই রওনা হইব। কোনও মতে রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিতে পারিলেই হইল। জিনিসের মধ্যেই বা কি ছিল! মাত্র কয়েকখানা বই। সব ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল, কেবল বই-গুলির উপর অত্যন্ত মায়া হইয়া গিয়াছিল। মনে হইত সেগুলি আহামদের পুত্র। মাসের ভাড়া পরিষ্কার করা ছিল, সুতরাং বাসা পরিত্যাগ করিতে আমার কোন ভয় হইতেছিল না। ভাবিলাম মহাজনকে একবার জানান দরকার। নারাণ মহাজন সেই বাসার মালিক, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মনে করিলাম পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে মাত্র মুখের কথাটী বলিয়া আসিলেই হইবে।

সন্ধ্যাকালে পেটের ব্যথা মোটেই রহিল না। কিন্তু প্রসবের সমস্ত লক্ষণ দেখা দিল।

রাত্রি কাটিয়া গেল। অতি প্রত্যুষেই বিছানা হইতে উঠিলাম। এবং স্নানাদি শেষ করিলাম। উপাসনা শেষ করিয়া যেমন দরজা খুলিতে

যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম, বৃদ্ধ নারাণ মহাজন সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া আমার ভয় হইল। হাতে তাঁহার মালা ছিল।

মহাজন কহিলেন, "তুমি এখনও বাসা পরিত্যাগ করিবার নাম করিতেছ না। অনেক টাকা বাকী পড়িয়া আছে। হিসাব পরিষ্কার করিয়া অবিলম্বে বাসা ছাড়িয়া দাও।"

আমি অত্যন্ত নম্র হইয়া কহিলাম, "আমি আপনার কাছেই ত যাইতেছিলাম। আমি আজই বাসা ছাড়িয়া যাইব। আপনার বোধ হয় ভুল হইয়াছে। আহামদ সাহেব ত ভাড়া বাকী রাখেন নাই; তিনি ত বড় ভদ্র লোক ছিলেন।

মহাজন ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিলেন, বটে রে মাগি! হারামজাদী, হারামি, শূয়ারকা বাচ্চা। আহামদের রক্ষিতা তুমি, তুমি ত তাহাকে ভদ্রলোক বলিবেই। আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি? পাওনা চল্লিশ টাকা যদি এখনই পরিষ্কার করিয়া না দিস্ তাহা হইলে এখনই জুতার আঘাতে তোর মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।"

গোলমাল শুনিয়া অনেকে দৌড়িয়া আসিল। যাহারা আহামদের দ্বারা কত ভাবে উপকৃত হইয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে ও আমাকে বদমায়েস ও হারামী বলিতে ছাড়িল না।

আমি আর কথা কহিলাম না। ঘরের দিকে আঙ্গুল উঠাইয়া বলিলাম—এ বাসায় যাহা আছে সবই আপনার রহিল। আঁচলে আমার শেষ সম্বল ১৫ টাকা, অমলা প্রদত্ত পাঁচ টাকা মোট ২০টী টাকা ছিল। সব খুলিয়া মহাজনের হাতে দিয়া বাসা হইতে চিরদিনের মত বাহির হইয়া পড়িলাম। নিজে ধূলিতে মিশিয়া বজ্রের আঘাত সহ্য করিয়াও যদি

আহামদকে এ কলঙ্কের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম তাহাতেও আমার সুখ ছাড়া দুঃখ ছিল না।

এক পয়সা হাতে রহিল না, ট্রেণের ভাড়াটা পর্য্যন্ত নাই। আমার শেষ পয়সাটী পর্য্যন্ত নীরবে ক্রোধ ও ঘৃণায় মহাজনের হস্তে প্রদান করিলাম। সেই পাষাণ-হৃদয় কিছু মাত্র বিচলিত হইল না।

মহাজনের কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধে ঘৃণায় গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

বরাবর ষ্টেশন অভিমুখে যাইতে লাগিলাম। ভয় হইতে লাগিল, বিনা টিকিটে গাড়ীতে ত উঠিতে দিবে না। টিকিট বাবুদের কয়লা, কেরোসীন তৈল, বস্তার চিনি, ময়দা, মুরগী এবং মৎস্য লইবার বেলা ধর্ম্মের কথা মনে থাকে না, তাবৎ ধর্ম্মজ্ঞান আসিয়া জুটে যখন একটা লোক কোন কারণে টিকিট না আনে। এই ধর্ম্মজ্ঞানের মূল্য মাত্র দুই পয়সা দিলেই সমস্ত আগুন নিবিয়া যায়। তখন আর কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না।

যখন আমি হ্যারিসন রোডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন পেটের মধ্যে ভয়ানক ব্যাথা অনুভূত হইতেছিল, ভগবানকে একবার প্রাণপণে ডাকিয়া বসিয়া পড়িলাম। ওঃ সে যে কি ভয়ানক ব্যথা! তাহা মনে উঠিলে, হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রসবের কি দারুণ যন্ত্রণা! সন্তান এতই ব্যথার জিনিস।

উঠিতে চেষ্ট করিলাম, পারিলাম না। মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলাম, ভগবান্! উদ্ধারের এত কাছে আনিয়া আমাকে এত দুর্গতিগ্রস্ত করিও না। কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হয় না। তিনি মানুষের প্রাণে ছুরি হানিয়া তাহার মহান্ নিভৃত উদ্দেশ্য সাধন করেন।

আমি বসিয়াছিলাম। ব্যথায় ল্যাম্প-পোষ্ট ধরিয়া মাটীতে শুইয়া পড়িলাম। গুণ্ডারা সব বলিয়া যাইতেছিল, "শালী রাণ্ডি আবি ঠিক হোগা।"

প্রবল রক্তধারা পড়িতে লাগিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। হায় হায়! কলিকাতার রাস্তায়, সহস্র উদাসীন মানুষের সম্মুখে, দিনের আলোকে ভগবান্! আমাকে এমন করিয়া লজ্জা দিলে—এই কথাগুলি আমি বড় বড় করিয়া বলিয়া উঠিলাম।

ভগবান্ তাহা শুনিলেন না। প্রবল যাতনায় গলা হইতে যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ আপনা হইতেই বাহির হইতেছিল। সে কি ভীষণ শব্দ!

দোকানদারেরা ক্রোধে বলিয়া উঠিল, 'পুলীশ, পুলীশ, কোথা হইতে আপদ্ আসিয়া জুটিল?' ছেলেরা ও যুবকেরা আমার পার্শ্ব দিয়া রাজার সাজে সজ্জিত হইয়া সেকেন্দার শাহের গর্ব্ব বুকে লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, কেহ আমার দিকে ফিরিয়া তাকাইল না। এক ব্যক্তি একটু দাঁড়াইয়া দয়া করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আহা বেচারী বড় কষ্ট পাইতেছে।' তাহার দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলাম। 'বাবা! একটু জল, পিপাসায় আমার কণ্ঠ ফাটিয়া গেল।' সে একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

ট্রামগাড়ীগুলি একটার পর আর একটা চলিয়া যাইতেছিল। গাড়ীর মধ্যে কত বাবু! চোখে কত দামী চশমা! কেহ হাসিতেছিলেন, কেহ হাত নাড়িতোছলেন, কেহ ধূমপান করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলাম, হায়! তাঁহাদের বুঝি মাতা ভগ্নী নাই। তাঁহারা বোধ হয় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন নাই, তাঁহাদের মা বোধ হয় প্রসবকালে এমন কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করেন নাই।

কেহ কেহ দাঁড়াইয়া আমাকে দেখিতেছে। আমার আর জ্ঞান রহিল না।

*　　　*　　　*

যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম রক্ত ও জলের মধ্যে গোলাপ ফুলের মত একটা ক্ষুদ্র শিশু পড়িয়া আছে। বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা! রক্ত-ধারায় আমার সমস্ত কাপড় সিক্ত। সে ব্যথা ও যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া শিশুটীকে কোলের কাছে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। পিপাসায় কণ্ঠ ফাটিয়া যাইতেছিল। কেহ আসিল না, কেহ একটু জল দিল না। দোকানীরা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছিল—'রাস্তার সম্মুখে এ বিরক্তিময় আবর্জ্জনা কোথা হইতে আসিল? কতক্ষণে ইহা পরিষ্কার হইবে? প্রভাতে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, ইত্যাদি।' এক ব্রাহ্মণ গঙ্গা হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিল, বোধ হয় তাহার পায়ের দিকে লক্ষ্য ছিল না। নিকটে আসিয়া আমার উপর দৃষ্টি পড়িবা মাত্র 'রাম রাম' বলিয়া সে সাত হাত দূরে লাফাইয়া পড়িল। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম।

কিন্তু আর পারিতেছিলাম না। আর একটু পরেই প্রাণ বাহির হইতে যাইবে। পা-খানি অতি কষ্টে শিশুর মুখের উপর ধরিলাম। রৌদ্রতাপ ক্রমশঃ ভীষণাকার ধারণ করিতেছিল। কি ভীষণ যাতনা! পেট জ্বলিয়া যাইতেছিল। আর একটু পরেই প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।

এমন সময় হেদোর দিক্ হইতে একখানি ট্রাম শব্দ করিতে করিতে আসিতেছিল। আমি অতি কষ্টে সে দিকে মুখ ফিরাইলাম।

সহসা একটী বাবু ট্রাম হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। ট্রামের তখন ভীষণ বেগ। সঙ্গে সঙ্গে আর একটী পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক লাফাইয়া পড়িল।

বাবুটীর চোখে একটা নিকেল ফ্রেমের চশমা। মাথায় অল্প অল্প চুল। পরনে সাদা ধুতি, গায়ে একটা সাদা টুইলের সার্ট, স্কন্ধে একটা চাদর। পায়ে এক জোড়া কাপড়ের জুতা। বালকটীর পোষাক সাহেবী ধরণের। মাথায় একটা বুয়ের-ক্যাপ।

বাবুটী অতি ক্ষিপ্রগতিতে আমার নিকট আসিয়াই আমার জলসিক্ত মাথাটী উরুদেশে তুলিয়া লইলেন। আমি অতি কষ্টে বলিলাম 'বাবু একটু জল।' বাবু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'দীনেশ! ঐ জলের কল থেকে তোমার হ্যাটে করিয়া শীঘ্র একটু জল আন এবং সত্বর এক খানা গাড়ী ডাক।' বালক তীরের মত ছুটিয়া গেল।

আমি পা উঠাইয়া শিশুটীকে দেখাইলাম। তিনি এক হস্তে আমার মাথা ধরিয়া অন্য হস্ত দ্বারা ধীরে ধীরে শিশুটীকে টানিয়া আনিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার কাপড় রক্তসিক্ত হইয়া গেল। তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। এমন সময় বালক তাহার টুপিটীতে জল ভরিয়া দৌড়িয়া আমার বাম পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর শিশুটীকে বালকের হস্তে দিয়া ভদ্রলোক আমাকে জলপান করাইয়া দিলেন। একটু শান্তি বোধ হইল।

একটু পরেই গাড়ী আসিল। বাবু ও সেই বালকটী আমাকে ধরাধরি করিয়া গাড়ীর মধ্যে তুলিলেন। গাড়ী বেগে হেদোর দিকে ছুটিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রায় দশ দিন পরে আমি একটু সুস্থ হইলাম। শিশুটী তিন দিন পরেই মরিয়া গিয়াছিল। যে মহানুভব ভদ্রলোকটী আমাকে এমন করিয়া যত্ন করিলেন তাঁহার নাম সুরেনবাবু। সেই বালকটী সুরেন বাবুর শ্যালক। তাহার নাম দীনেশ, সে কথা তুমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছ। তাঁহারা নেটিব খ্রীষ্টান। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক আমাকে তাঁহাদের অন্নগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

ছয় মাস পরে খ্রীষ্টান হইলাম। বিশ্বাসে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করি নাই। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা আমাকে খ্রীষ্টান করিয়াছে। তত্রাচ আমি মুসলমান।

সুরেনবাবু আমাকে ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন।

প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। সুরেন বাবুর কাজ ছিল যত অন্ধ, খোঁড়া, পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাদের সেবা, আর ছোট ছোট শিশুদের সহিত খেলা ও তামাসা করা। আমি তাঁহার গৃহের সমস্ত কাজই অতি আনন্দের সহিত করিতাম। তাহার সংসারে আর কেহ ছিল না। মাত্র দীনেশ। দীনেশ তাঁহার মৃত স্ত্রীর ভাই। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। আর তিনি বিবাহ করেন নাই।

তিনি আমাকে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং অতি অল্প দিনে আমি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া ফেলিলাম।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বাল্যকাল হইতে খ্রীষ্টান বিশেষতঃ নেটিভ খ্রীষ্টানকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতাম। তাহাদের মুখ দেখিলে আমার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু সে ভাব আর বর্ত্তমানে আমার নাই। সব ধর্ম্মেই মানুষ আছে।

সুরেনবাবু কলিকাতাতেই থাকিতেন। তাঁহার কাজ ছিল বক্তৃতা করা। তাঁহার পিতা বোম্বায়ের এক সিভিলিয়ন ছিলেন। বহুকাল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার এক ভাই যুক্তপ্রদেশে, এক কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মাসে মাসে যাহা পাইতেন, তাহার অধিকাংশ মানুষকে ধার দিতে দিতেই ফুরাইয়া যাইত। যখন না থাকিত তখন তাঁহাকে কখনও অসুবিধায় পড়িতেও দেখি নাই। সামান্য পথের মুচী দুঃখীরাম, মৎস্যবিক্রেতা রমেশ পাঁড়ুই, মুটে বলাই সিংহ, গাড়োয়ান হামিদ সেখ, ধোপা হোসেন লাল ছিল তাঁহার খাতক। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন—মানুষকে ধার দিয়া দিয়া অনেক টাকা উড়িয়া গিয়াছে। আমি কহিলাম,—'আপনি এত ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন, তবুও যে আবার টাকা ধার দেন!'

তিনি বলিলেন,—টাকাগুলি থাকিলে আমার উপকার হইত। তাহা না হইয়া অন্য কতকগুলি লোকের ত উপকার হইয়াছে। সেগুলি তো আর জলে পড়ে নাই।

আমি বিস্মিত হইয়া আর কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।

কাহারো উপকার করিলে যদি সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত তবে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। এমন কি তাহার সহিত আর দেখা করিতেন না।

আমি যদি কখনও কোন কথায় বা ব্যবহারে সঙ্কোচ বোধ করিতাম,

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। সত্য বলিলেই তিনি তজ্জন্য দুঃখিত হইতেন। আমার সহিত তিনি নিতান্ত বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। তিনি আমার কতখানি উপকার করিয়াছেন ইহা কোনও প্রকারে আমার দ্বারা প্রকাশিত হইতে দিতেন না। আমাকে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অসঙ্কোচে, 'সুরেনবাবু' বলিয়া ডাকিতে হইত। তাঁহার সম্মুখে আমি প্রথমে চেয়ারে বসিতে লজ্জিত হইতাম, তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া একদিন অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার দুঃখ মৌখিক নহে। পক্ষান্তরে তিনি আমার সহিত এমন ব্যবহার করিতেন যেন আমি তাঁহার কত উপকার করিয়াছি, তিনি যেন আমার কাছে শতপ্রকারে ঋণী!

প্রত্যহ সন্ধ্যা বেলা আমি, সুরেনবাবু ও দীনেশ বারান্দায় বসিয়া নানা কথা আলোচনা করিতাম। একদিন এমন সময় হঠাৎ মিষ্টার মর্ণো যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সুরেন বাবুর সহিত মিষ্টার মর্ণোর অনেক দিন হইতে পরিচয় ছিল। এমন কি তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। সুরেন বাবু তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে দিলেন। একথা ওকথার পর মিঃ মর্ণো বলিলেন, "সুরেন বাবু, আমার স্ত্রীর এখন আসা হইতেছে না। গৃহকর্ম্ম পরিদর্শন জন্য আমার একজন পরিচারিকা আবশ্যক। আমি যারপর নাই অসুবিধায় পড়িয়াছি। আপনাকে আমার জন্য একটু পরিশ্রম করিতে হইবে। একজন শিক্ষিতা মহিলা আবশ্যক। তাহাকে ধোপা, দুগ্ধ ও বাজারখরচ ইত্যাদি সংসারিক সমস্ত বিষয়ের হিসাব রাখিতে হইবে। মাঝে মাঝে পুস্তক ও খবরের কাগজ পড়িয়াও শুনাইতে হইবে। বেতন ৪০৲ ৫০৲ টাকা।

সুরেন বাবু একটু চিন্তিত হইয়া কহিলেন, 'আপনার যদি বিশেষ কষ্ট হয় তবে কিছু দিনের জন্য আমার এক আত্মীয়া আপনার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন। বেতনের কোন আবশ্যকতা নাই।'

আমি কহিলাম—কে ?

সুরেন বাবু কহিলেন, "আপনার কথাই বলিতেছি। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। উনি একজন আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ; আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সেখানে যান, তাহা হইলে মিষ্টার মর্ণোর একটু সুবিধা হয়। মিসেস্ মর্ণো আসিলেই আপনি চলিয়া আসিবেন।"

সুরেন বাবুর নিজকে যে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে তাহা তিনি একবারও ভাবিলেন না এবং মিঃ মর্ণোকেও জানিতে দিলেন না।

* * *

ইহার কয়েক দিন পরেই আমি এখানে চলিয়া আসিলাম। সুরেন বাবু প্রত্যহ এখানে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতেন।

প্রায় দুই মাস পরে, সুরেন বাবু শিলং বদলী হইলেন। আমাকে লইতে আসিলে, মিঃ মর্ণো এখানে আরও কিছুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার সাংসারিক শৃঙ্খলা একদম লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে শুনিয়া, সুরেন বাবু হৃষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি এখন শিলঙে আছেন। ছয় মাস পর তোমরা আসিলে। আমি যাইতে চাহিলেও মর্ণো সাহেব আমাকে ছাড়েন না। বলেন, আমি না থাকিলে সংসারে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, তা ছাড়া তিনি আরও বলেন—আমি তোমাদের একজন হইয়া গিয়াছি। লোকে জিজ্ঞাসা

করিলে বলেন 'আমি তাঁহার স্ত্রীর ভগ্নী।' কথায়, কাজে, উঠা বসায় আমি একেবারে বিলাতী হইয়া গিয়াছি। নামটী পর্য্যন্ত অন্য রকমের কেহ বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারে না।

আমার নাম এখন মিস্ সিরেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

এডেন ভ্যালীতে আজ এক বৎসর পরে ফ্লোরাকে একদিন বৈকাল বেলা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ইষ্টার নদীর ধার দিয়া চলিয়া যাইতে দেখা যাইতেছিল। পাকা রাস্তা, লতা পাতা ফুলের গাছ দিয়া দুই পার্শ্ব সজ্জিত। বৈকালের ম্লান সূর্য্যরশ্মি, সাদা ধবধবে বাড়ীগুলির উপর পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল।

ছোট ছোট একতালা বাড়ী। সম্মুখভাগ শ্যামল দূর্ব্বাঘাসে ভরা। নানা টবের মধ্যে নানা রকমের বিচিত্র লতা ও ফুলের গাছ;—বাগানের এখানে ওখানে, বারাণ্ডার ধারে, জানালার পার্শ্বে প্রত্যেক স্থান সজ্জিত। ঘরগুলি বড় বড় জানালায় ভরা—যেন বাহির ও ভিতরের সঙ্গে একখানা ছাদ ছাড়া বিশেষ পার্থক্য নাই। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আনন্দ ও চঞ্চলতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তির মত ছুটিয়া বেড়াইতেছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ফ্লোরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আজ এক বৎসর হইল আয়ার্লণ্ডে চলিয়া আসিয়াছে। মিঃ মর্ণোও কিছু দিন হইল ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মিস্ সিরেলকে তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। উইলিয়মের লেখা পড়ার ইংলণ্ডেই সুবিধা হইবে ভাবিয়া তিনি জন্মভূমি আয়ার্লণ্ডে আসিতে পারিতেছেন না। ছেলেকে একা একা স্বাধীনভাবে অন্যের তত্ত্বাবধানে রাখিতে তিনি সাহস করেন না, তাই বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিয়াও লণ্ডনে আছেন। উইলিয়মের মাতাও স্বামীর গৃহে থাকেন। তাঁহাদের বাসা টেম্পল ষ্ট্রীটের কাছে। বেশ মুক্ত স্থান। সহরের আঁটা-আঁটী ঠাসাঠাসী সেখানে নাই। কাছেই একটা বৃহৎ উদ্যান, সুতরাং স্থানটী বেশ মনোরম।

সেমেরা ইচ্ছা করিয়াছিলেন একবার তাঁহার পিতৃভূমি এডেন ভ্যালীতে যাইয়া মায়ের সমাধিটা দেখিয়া আসেন, কিন্তু মিঃ মর্ণো, নানা অসুবিধা হইবে বলিয়া অনুমোদন করেন নাই।

ফ্লোরা এখন পূর্ণ যুবতী। তাহার মাথার চুল, চোখের চাহনী, মুখের গঠন, উন্নত বক্ষঃ, গোল দুখানি হাত এবং চলন শত সৌন্দর্য্যে ভরিয়া গিয়াছে। ফ্লোরা তাহা আদৌ বুঝিতে পারে না। তাহার মা মরিয়া গিয়াছেন, সে কথা আগেই বোধ হয় বলা হইয়াছে। বাড়ীতে এক কাকা এবং দুইটী ভ্রাতৃষ্পুত্র। মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন চিরকালই তিনি তাহাকে একটা হতভাগা ঘয়বা মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু বলেন নাই। তাহার কাকাও সব সময় বলিতেন, এই কুৎসিৎ মুখ-ফোলা, পেট-মোটা মেয়েটাই তাহার মাতার অকালমৃত্যুর কারণ।

সে তাহার নিজের গৌরব নিজে না বুঝিলেও, সাদা গাউন পরিয়া, পালকশোভিত একটা টুপী মাথায় দিয়া যখন সে গ্রাম্য রাস্তা দিয়া

হাঁটিয়া যাইত তখন অনেকগুলি যুবকের মনে হইত যেন একটা সুন্দর শুভ্র চাঁপা ফুল উড়িয়া যাইতেছে।

কয়েকখানি বই পড়িয়া এবং আত্মীয় বন্ধুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া সে যে সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিয়াছিল—তাহাই তাহার সম্বল। নূতন চিন্তা দিয়া সে কখনো জোরে কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিত না। বসন্তের মৃদু বাতাসের মত সুন্দর ও মধুর, এবং ফুলের মত স্নিগ্ধ ও কোমল তাহার জীবনটা। সকলের সঙ্গেই আলাপ, সকলের সঙ্গেই তাহার কোমল হাতের কোমল করমর্দ্দন। কাহারো জন্য তাহার বেদনা নাই, প্রশান্ত মনে সে রাত্রে ঘুমায়—কেবল মিস্ সিরেলের কথা তাহার মাঝে মাঝে মনে হয় এবং দেখা করিবার জন্যও তাহার বড় ইচ্ছা করে। আর একটা যুবকের ছবি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তাহাতে সে লজ্জায় সরমে মরিয়া যায়।

গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রায় এক মাইল পথ সে হাঁটিয়া গেল, এমন সময় মোড় ঘুরিয়া একটা যুবক সহসা ফ্লোরার সম্মুখে উপস্থিত। সে লোককে দেখিয়া সে কেমন যেন হইয়া গেল। যোসেফ হাত বাড়াইয়া তাহার সহিত করমর্দ্দন করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ফ্লোরার হাত উঠিতেছিল না। সে অতি কষ্টে—লজ্জায়—সরমে হাত উঠাইয়া যোসেফের কর স্পর্শ করিল।

এই ত সেদিনকার মেয়ে সে। এরি মধ্যে সে যে কেমন করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট যুবককে দেখিয়া দারুণ লজ্জা অনুভব করিতে শিখিয়াছে, ইহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। যোসেফের উন্নত নাসিকা, বিস্তৃত বক্ষোদেশ, নীল চোখের সম্মুখে সে নিজকে বড় দীন মনে করিতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস সে বড় কুৎসিৎ! তাহার চিবুক দুখানি অস্বাভাবিকরূপে

মাংসল, মাজখানা নিতান্তই নিগ্রো রমণীর ন্যায় ; এবং কোন পুরুষ যে তাহাকে কোন কালে বিবাহ করিবে তাহা সে বিশ্বাস করিতে সাহস করিত না। তা ছাড়া কাকার সম্মুখে সে কেমন করিয়া কোন পুরুষকে বিবাহ করিবে ? উহা যে বড় ঘৃণার কথা, বড় সরমের কথা।

প্রাণ না চাহিলেও সে তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিল, পাছে তাহার কাকা জানিতে পারেন—সেদিনকার মেয়ে ইহারি মধ্যে যুবকের সম্মুখে—মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠে, ছি ! ছি ! কি সরমের কথা !

দূর হইতে একখানা গাড়ী আসিতেছিল। ফ্লোরা কি করিবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। ভয়ে লজ্জায় সে কাঠের মত হইয়া গেল। জন-মানবশূন্য রাস্তার মধ্যে সে এক যুবকের সঙ্গে দাঁড়াইয়া।

একটু পরেই গাড়ী হইতে জর্জ্জ লাফাইয়া পড়িল। সে ডাবলিন হইতে আসিতেছে। ডাবলিনে সে কলেজে পড়ে। ফ্লোরা জর্জ্জকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং হাত বাড়াইয়া তাহার সহিত করমর্দ্দন করিল। ফুটফুটে জোছনার দলার মত ফ্লোরার এত অধিক আগ্রহপূর্ণ করমর্দ্দনে জর্জ্জ নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ মনে করিল এবং যোসেফের সম্মুখে একটু গৌরবও অনুভব না করিয়া পারিল না।

কোচোয়ানকে গাড়ীখানা ও জিনিস পত্র লইয়া বাড়ী যাইতে বলিয়া জর্জ্জ যোসেফের দিকে ফিরিয়া একটু বিস্ময়মাখা স্বরে কহিলেন —ওঃ মিঃ জোসেফ, ছি, ছি, তুমি দাঁড়িয়ে আছ, একথা আমার স্মরণই নাই—ক্ষমা কর ভাই, এস করমর্দ্দন করি।

যোসেফ মৃদু হাসিয়া তাহার কথার উত্তর দিলেন।

যোসেফ একটু দূরে দূরে থাকিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। জর্জ্জ

ফ্লোরার বাহু ধরিয়া কথা কহিতে লাগিল। ফ্লোরার ইচ্ছা—যোসেফ আপনা হইতেই তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায় এবং জর্জ্জকে কোন সুযোগ না দিয়া তাহার সহিত কথা বলে। সে এক একবার অন্তরের আগ্রহ ও বাহিরের উপেক্ষা ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যোসেফকে দেখিয়া লইতে-ছিল। যোসেফ বড় সুন্দর।

এমন সময় ফ্রান্সিস পার্শ্বের বাড়ী হইতে, 'মিষ্টার জর্জ্জ! মিষ্টার জর্জ্জ কেমন আছেন?' বলিতে বলিতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

——:o:——

বাড়ীতে আসিয়া রাত্রিকালে জর্জ্জের মনে প্রশ্ন হইতে লাগিল, 'ফ্লোরার এত আগ্রহের সহিত কথা বলিবার কারণ কি?'

রাত্রি এগারটা। তখনও ঘুম আসে নাই। জর্জ্জদের বাড়ী ফ্লোরার কাকার বাড়ী রোজাভিলা হইতে বেশী দূরে নহে। মাঝে দশ এগারখানা বাড়ী, নাম সেনা-ভিলা।

জর্জ্জের পিতা ডাবলিন সহরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার। জর্জ্জ গ্রামের মধ্যে বড় ভাল ছেলে, তার বন্ধু যোসেফ্। ফ্রান্সিস্ তাহাদের বাল্যবন্ধু হইলেও সে একটু অন্য প্রকৃতির, তাহাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া সে কথা কহিত না, এবং মাঝে মাঝে নানাপ্রকার কলহ করিয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টা করিত। ফ্রান্সিসের পিতা একজন বিখ্যাত সওদাগর, তাহা ছাড়া অনেক ভূসম্পত্তিও ছিল। ফ্রান্সিস ক্রূরহৃদয় এবং নিন্দুক।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

জর্জ্জ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিল আর ফ্লোরার আঁখির সৌন্দর্য্য চিন্তা করিতেছিল।

কিছুদিন হইতে তাহার জীবনে এক আকস্মিক পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে আর কোথায়ও কোন কাজে আনন্দ পায় না। পড়া শুনা মোটেই ভাল লাগে না। সংসারের সব জিনিসই—সব দৃশ্যই বিরক্তিকর। মানুষই তাহার ঘৃণার পাত্র। বাড়ী আসিলে হৃদয়ের একটু পরিবর্ত্তন হইবে ভাবিয়া সে ডাবলিন ছাড়িয়া বাড়ী আসিতেছিল। পথে তাহার ফ্লোরার সহিত দেখা।

সে যতই ফ্লোরার কথা চিন্তা করিতে লাগিল, ততই যেন সে শান্তি পাইতেছিল। বাতাসগুলি যেন তাহার গায়ের উপর অনেক দিনের পরে শান্তি-আনন্দধারা ঢালিয়া দিতে লাগিল। তাহার ঘুম আসিতেছিল না, কেবলই সে ফ্লোরার কথা লইয়া বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল।

সে অনেক রমণী দেখিয়াছে, কিন্তু কাহারও কথা সে ভাবিত না। কাহাকেও সে লক্ষ্য করিত না। নিজের পড়া শুনা ও উচ্চ হাসি লইয়া চিরদিনই সে মগ্ন থাকিত। আজ সে ইচ্ছা করিয়াই ফ্লোরার কথা ভাবিতেছিল—ফ্লোরার মুখখানি বড় সুন্দর, কেমন সরল ও অমায়িক প্রকৃতির সে। তাহার চুলগুলি কেমন লতার মত। তাহার হাত দুখানি কেমন গোল—তুষারের মত শুভ্র এবং মাখনের মত নরম।

সে যদি আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়, তবে ঘরখানি কত মধুর হয়, রজনী কেমন প্রাণারাম হয়, বাতাস কত স্নিগ্ধ হয়, দেবতাকে কেমন ডাকা যায়, মানুষের মুখ কেমন সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, কেমন ধীর ও শান্তভাবে বইগুলি পড়া যায়। ইত্যাদি।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

———০:০:০———

মিঃ মর্ণো উইলিয়মের দুই হাত বাঁধিয়া প্রহার করিতেছিলেন। সে বোকা, সে গর্দ্দভ, কিছুই সে বুঝে না ইহাই উইলিয়মের অপরাধ। মর্ণো নিজেই তাঁহার পুত্রকে শিক্ষা দিতেন। অন্যলোকের হস্তে শিক্ষার ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না।

একটি অত্যন্ত কঠিন অঙ্ক তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল, উইলিয়ম একটুও চিন্তা করে নাই। সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না প্রশ্নটা কি ? সে ছেলে মানুষ হইতে পারে, কিন্তু তাহার কি মাথা নাই! মানুষে যাহা পারিয়াছে তাহা সে কেন পারিবে না ?"

উইলিয়মের কাতর আর্ত্তনাদ শুনিয়া মিস্ সিরেল আসিয়া তাহার বাঙ্গালী হৃদয় লইয়া বালককে জড়াইয়া ধরিল। লেডি সেমেরা তাহার ধৈর্য্যধারণ ক্ষমতা বিসর্জ্জন দিয়া মিঃ মর্ণোকে কহিতে লাগিলেন—তুমি একটা অপদার্থ বুলডগ, বলি এমন করিয়া কি ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইতে হয় ? সে যদি নিরেট গর্দ্দভই হইয়া থাকে তবে সে তোমারই ঔরসের গুণে। যেমন মাথা, তেমনি বিদ্যে শিখালেই হয়। তুমি এক রাত্রে তাকে নিউটন, সক্রেটিস করে তুলতে চাও না কি ?'

মিঃ মর্ণো ক্রোধে কাঁপিতেছিলেন। তিনি নিকটস্থ বাক্স হইতে বন্দুক বাহির করিয়া লেডী সেমেরাকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইলেন। সিরেল তাঁহার হাত চাপিয়া না ধরিলে কি হইত তাহা বলা যায় না। এমন সময়

বালক ভৃত্য আসিয়া সাহেবের হাতে একখানা কার্ড দিল। তাহাতে লেখা ছিল নীলরতন গাঙ্গুলী—ভারতবর্ষ।

মিঃ মর্গো মিস্ সিরেলকে সজ্জিত হইতে বলিয়া কহিলেন,—ভারতবর্ষ হইতে এক ভদ্রলোক আসিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হও।

আপাততঃ উপস্থিত কলহ বিবাদ হইতে মুক্ত হইতে পারা গেল ভাবিয়া মিস্ সিরেল একটু সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাড়াতাড়ি কাপড় পরিতে গেলেন।

নীলরতন ব্যারীষ্টার হইবার জন্য ভারতবর্ষ ছাড়িয়া তিন বৎসরের জন্য সুদূর ইংলণ্ডে আসিয়াছেন। তিনি বড়ঘরের ছেলে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে গেলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়—ইহা তিনি মোটেই মানিতেন না। তাই বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও সমাজের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া বিলাতে আসিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ভারতে যাইয়া তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন।

মর্গোর সহিত তাঁহার একটু জানা শুনা ছিল। মর্গো সাহেব যখন ভারতবর্ষে ছিলেন তখনকার কথা বলিতেছি। লণ্ডনে যাহাতে তিনি উচ্চ সমাজে মিশিতে পারেন সেই জন্য তিনি বিশেষ করিয়া মর্গোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

মর্গো বাহিরে কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী, কি ইউরোপীয়ান, কি ভারতবাসী, কি জাপানী, কি নিগ্রো সকলের সহিতই অতি অমায়িক ব্যবহার করিতেন।

কলহ হইতে অব্যাহতি পাওয়া গেল ভাবিয়া সরলা একটু আনন্দিত হইলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু পরক্ষণেই ভারতবর্ষের নাম শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। যে দেশ হইতে তাড়িত হইয়া তিনি সুদূর ইংলণ্ডে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন, যে দেশের মানুষ মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করিতে

লজ্জা বোধ করে, যেখানকার মানুষ মানুষকে পশু করিয়া আনন্দ লাভ করে, যে দেশের পুরুষেরা তাহাদের জননীর জাতিকে গরুর চেয়ে অধম করিয়া রাখে, সেই দেশ হইতে একটী লোক আসিয়াছে? কেন, কি জন্য? মর্ণোর অনুরোধ না রাখিলে চলে না। সরলা ধীরে ধীরে নীচে নামিলেন।

বৃদ্ধ মিঃ মর্ণো ওয়েটিংরুমে নীলরতনকে ডাকিবার জন্য ভৃত্য পাঠাইয়া মিস্ সিরেলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবিলম্বে সরলা একখানি চেয়ার টানিয়া বসিবামাত্র নীলরতন অভিবাদন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মর্ণো ও মিস্ সিরেল উভয়েই উঠিয়া নীলরতনকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। বসিবার সময় নীলরতন সরলা ও মর্ণোকে পুনরায় অভিবাদন করিলেন।

মর্ণো অত্যন্ত মিষ্ট স্বরে কহিলেন,—আপনাকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইতেছি। অনেক দিন হইতে ভারতবর্ষ ছাড়িয়াছি, ভারতবর্ষের লোক দেখিলে আমার বড় আনন্দ হয়।

নীলরতন বলিলেন,—ভারতবর্ষের লোককে আপনি ভালবাসেন ইহা আমি বেশ জানি। অপনার কাছে এসে আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। ব্যারীষ্টার হবার জন্য আমাকে তিন বৎসর এখানে থাকিতে হইবে।

ব্যারীষ্টার! ব্যারীষ্টারের নাম শুনিয়া সরলার গা জ্বলিয়া উঠিল। ব্যারীষ্টার জীবনকুমার রায়ের দারোয়ান কর্ত্তৃক তিনি একদিন অপমানিতা ও নিগৃহীতা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার দারুণ ক্রোধ উপস্থিত হইল। ইচ্ছা হইল সরলা নীলরতনকে পদাঘাতে পথে তাড়াইয়া দেয়। তাঁহার চিবুক সহসা লাল হইয়া উঠিল। এই সব মানুষই ভারতবর্ষের পিতা মাতা।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

সরলা তাহার ক্রোধ চাপিয়া রাখিল। সে প্রলুব্ধ হইতেছিল—ব্যারীষ্টার জীবনকুমারের পরিবর্ত্তে তাহার মাথায় কয়েক ঘা লাগাইয়া দেয়। মানুষ এমনি, সে একজনের কাছে বেদনা পাইয়া আর এক জনের মাথায় আঘাত করিয়া প্রতিশোধ লইতে চায়। ভারতবর্ষের নাম শুনিয়া ঘৃণায় ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল।

মর্ণো কহিলেন,—মিস্ সিরেল, তুমি ভদ্র লোকের সহিত কিছু আলাপ করিয়া আনন্দ লাভ কর।

সরলা মৃদু হাসিয়া কহিল,—মিষ্টার নীলরতনকে দেখে বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তা আপনি মাঝে মাঝে এসে আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

সরলা পরক্ষণেই মনে মনে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া ভাবিলেন—কেন এই ভারতবাসীকে বারে বারে আসিয়া বিরক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

কিন্তু আর উপায় ছিল না। ভদ্রতার খাতিরে অন্ততঃ এই সামান্য কথা কয়টী তাহাকে বলিতেই হইত।

নীলরতন কহিলেন,—আপনার কথা শুনে আমি বড় সুখী হলেম। আপনার সঙ্গে মিশে ও কথা বলে আমি নিজকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিতেছি, আসা যাওয়ার সুবিধাটুকু দেওয়া আপনার অনুগ্রহ। যদি ভৃত্যের অনুরোধ রক্ষা করেন, তাহা হইলে আপনাকে ও মিঃ মর্ণোকে কল্য সন্ধ্যাকালে গ্রে ক্লাবে নিমন্ত্রণ করিতে চাই।

মিঃ মর্ণো কহিলেন, অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আমরা আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

অতঃপর রাত্রি নয়টার সময় চা ও সামান্য জলযোগের পর নীলরতন বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় তিনি সরলার মুখের উপর একটু বেশী করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই জর্জ্জের ইচ্ছা হইল একবার সে রোজা ভিলায় যায়। শেষ রাত্রে তাহার ঘুম আসিয়াছিল কিন্তু আবার অতি প্রাতঃ-কালেই সে জাগিয়া উঠিয়াছে।

ধীরে ধীরে সে বারণ্ডার সিঁড়ি হইতে রাস্তার গেট পর্য্যন্ত যাইতেছিল আবার ফিরিয়া আসিতেছিল। কি উপলক্ষে সে এত ঊষাকালে ফ্লোরার কাছে যাইবে! এত ঘনিষ্ঠতা ত তাহার সহিত কখনও হয় নাই।

সে কত কথা ভাবিতেছিল আর ক্ষুদ্র বাড়ীর সম্মুখের রাস্তার উপর পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া করিতেছিল।

সে একবার ইচ্ছা করিল প্রাতঃকালটা বৃথা নষ্ট না করিয়া একটু পড়িলেও চলে। অবিলম্বে সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর সেল্‌ফ হইতে একখানা বই বাহির করিয়া দুই এক পাতা উল্টাইয়া দেখিল—সে খানা পড়িতে বড় ভাল লাগে না। আর একখানা সে বাহির করিল, সে খানাও ভাল নয়। আর এক খানা টানিয়া দেখিল, সেখানা অনেকবার সে পড়িয়া দেখিয়াছে, এবং উহার মধ্যে পড়িবার মত কিছুই নাই। তাহার পর সে বৃহৎ একখানা কবিতা গ্রন্থ বাহির করিল; দুই এক লাইন পড়িয়াই সেখানা সে দূরে বিছানার উপর বিরক্ত হইয়া ফেলিয়া দিল। সে আবার ভাবিল ইজি চেয়ারে বসিয়া একটু পাইপ টানিলেও হয়। অনেক ক্ষণ পাইপ টানিয়াও সুখ পাওয়া গেল না।

তাহার পর সে একবার বিছানায় চিৎ হইয়া গণিতে চেষ্টা করিল ছাদে কয়টা কড়ি বর্গা আছে। এত দিনেও তাহা কখনও দেখা হয় নাই। এক, দুই, তিন, চারি—পর্য্যন্ত তাহার পর সে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে বিরক্ত হইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কি বিপদ! এখনও সূর্য্য উঠিতেছে না। আর দেরী করা চলে না, ধৈর্য্যের ত একটা সীমা আছে? জর্জ্জ আর বিলম্ব করিতে পারিল না। হ্যাট ও ছড়িখানা লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বেশী দূরে নহে। দশ খানা বাড়ীর পরেই রোজা ভিলা।

সে ভাবিতে ছিল ফ্লোরা এখনও শুইয়া আছে। কিন্তু কেমন ভাবে শুইয়া আছে? তাহার মাথা কোন্ দিকে। চুল গুলি বালিশের অন্য পার্শ্বে বোধ হয় ঝুলিয়া আছে কিংবা সে গুলি পিঠের তলে জমাট বাঁধিয়া পড়িয়াছে। ফ্লোরা সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া যখন বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবে তখন তাহার অলসতা মাথা আঁখি, দুটী কেমন মধুর হয়। সে যখন সাজ সজ্জা করিয়া বাহিরে আসিবে, তখন তাহাকে প্রভাত কালের অচ্ছজল স্নাত মৃণালের মত নির্ম্মল সুন্দর সরল ও পবিত্র দেখাইবে। জর্জ্জ আবার ভাবিল—বড় সকালে যাইতেছি। এখনো সে ঘুম হতে উঠে নাই।

এই সময়ে সে রোজা ভিলার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কেউ উঠে নাই। ফাঁকা বারাণ্ডা খালিগায়ে একটা বিরক্তি মাখিয়া মলিন ভিখারীর মত পড়িয়া ছিল, সে দাঁড়াইল না। বরাবর রাস্তাধরিয়া ইষ্টার নদীর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

জর্জ্জ একটু বিস্মিত হইয়া ফ্রান্সিস্‌কে নমস্কার করিলে, সে জিজ্ঞাসা করিল—এত সকালবেলা এদিকে আসিবার কারণ কি?

জর্জ্জ কি উত্তর দিবে? নিতান্ত সত্যবাদী হইলেও সে যে একটা

বালিকার চিন্তায় আকুল হইয়া নিতান্ত মূর্খের মত এত সকাল বেলা বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে, এ দীনতার কথা টুকু সে কিছুতেই বলিতে পারে না। আর একি বলার কথা? সমস্ত রাত্রিটা ফ্লোরার চিন্তায় অতিবাহিত হয়েছিলো। সে একটা রমণীর চুল হইতে পায়ের অগ্রভাগ পর্যান্ত তাবৎ সৌন্দর্য্যের সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল—এ সব কথা কি শোনাবার? অন্তরে অন্তরে ভাবিলেও কে কাহার কাছে এসব কথা প্রকাশ করিয়া অপমানিত হইতে চাহে?

জর্জ্জ এমন একটি লোক, যে ভালবাসিতে পারে কিন্তু অপমান ও দীনতা সহ্য করিতে পারে না। সে তাহার অভিমান ও গৌরব বজায় রাখিয়াই কাহারো হৃদয় লাভ করিতে চাহে।

সে কোনও দিন কোন রমণীর দিকে চাহিয়া পর্য্যন্ত দেখে নাই; পাছে তাহাতে তাহার দীনতা ধরা পড়ে। রমণী সুন্দরী হইতে পারে, কিন্তু জর্জ্জ তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিতেও অপমান বোধ করিয়াছে। প্রত্যাশিত হওয়া দূরের কথা, সে যে কোন রমণীর কৃপার পাত্র বা কোন গৌরবিণীর প্রতি সামান্য একটা কটাক্ষ নিক্ষেপের জন্যও ঋণী এ কথাও সে প্রাণ থাকিতে স্বীকার করিতে পারে না।

জর্জ্জ মিথ্যা কথা না বলিয়া পারিল না। সে বলিল,—ডাকঘরে কাজ আছে। সেখানে যাচ্ছি। তুমি যাবে ত চল।

ফ্রান্সিসের কোন কাজ নাই। খায় দায়—আর ঘুরিয়া বেড়ায়। সে কহিল 'বেশ'!

উভয়ে একত্রে অগ্রসর হইতে লাগিল। ফ্রান্সিস গল্প করিতেছিল—জর্জ্জ তুমি ত এই বারেই পড়া শেষ করিবে। স্ত্রী খুজিতে তুমি হয় ত লণ্ডনে যাবে কি বল? লণ্ডন সুন্দরীদের সমাগমস্থল।'

জর্জ্জ কোন কথা কহিল না।

ফ্রান্‌সিস্ আবার কহিতে লাগিল—আমি ভাই মূর্খ মানুষ, তাতে দেখ্‌তেও কুৎসিৎ, আর কোন বিশেষ মেয়ে মানুষকেও ভালবেসে তৃপ্তি হয় না! সারা জীবনটা যদি নূতন নূতন কুমারীদের সহিত কোর্টসিপ করিয়া কাটাইয়া দিতে পারি, তা হলেই আমি সুখী, কি বল?

জর্জ্জ কথা কহিল না।

ফ্রান্‌সিস্ আবার কহিল,—তোমরা জ্ঞানী লোক। আজ কাল অল্প কথা বল!

জর্জ্জ একটু সঙ্কুচিত হইয়া কহিল,—ওঃ ক্ষমা কর ফ্রান্‌সিস্! আমি একটা কথা ভাবছিলেম। তুমি কি বল্লে? আবার বল!

ফ্রান্‌সিস্ কহিল—তুমি হতভাগ্য জীব! আমার বারে বারে কথা বলিবার অভ্যাস নাই। আমি বলেছি—তুমি কোন রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হয়েছ। নচেৎ আঁখির চাহনী এত স্থির কেন? এত অল্প কথার লোক ত তুমি নও।

জর্জ্জ কহিল,—প্রেম করিবার ধার ধারি না, কিংবা কোন রমণীর পিছনে পিছনে ঘুরিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে চাহি না! আমি রমণীর কথা ভাবিব! অসম্ভব কথা। জর্জ্জের কথা ভাবিয়াই রমণীকুল অনিদ্রায় কাল কাটায়, জর্জ্জ কাহারও কথা ভাবিয়া নিজকে ছোট করিতে চায় না! তুমি যেমন একটা অপদার্থ! শুধু প্রেমে পড়িলেই বুঝি মানুষ চিন্তা করে?

ফ্রান্‌সিস্ কহিল,—বেশ, দেখা যাবে। তুমি ইচ্ছা কর, তুমি রাজা হইয়া বসিয়া থাক আর রমণীরা নির্লজ্জের মত তোমার গায়ে আসিয়া ঢলিয়া পড়ুক। তুমি স্থির, ধীর, গম্ভীর হইয়া ইচ্ছা মত কাহাকেও লাথি

মারিয়া ফেলিয়া দিবে, কাহাকেও কৃপা করিবে। অথবা মনে কর, কোন রমণী আসিয়া ভালবাসায় অধীর হইয়া তোমার পদ চুম্বন করিল, তাহার পর তুমি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলে। সেটা অসম্ভব। তুমিও একটু ভালবাসিলে। তোমার বাঞ্ছিতাও তোমার দিকে একটু অগ্রসর হইল। প্রেমের বাজারে মান অপমানের কথা ভাবিলে চলিবে না। হইতে পারে তোমার ভালবাসার কথা শুনিয়া বা কটাক্ষে কোন রমণী বিরক্ত হইতে পারেন। তুমি হয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে ও দ্বিতীয় রমণীর সন্ধানে ছুটিবে, চিরজীবনের জন্য তারই ধ্যানে অবিবাহিত থাকিয়া সন্ন্যাসী সাজিবে।

জর্জ্জ বলিলেন,—তুমি আমাকে এত বোকা মনে করিও না। বক্তৃতাটা তোমার নিজস্ব, না অন্য কাহারো? আমি কোন রমণীকে ভালবাসিব আর সে বিরক্ত হইবে, সে আমাকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিবে! লোকে বলিবে—জর্জ্জ (ধর) 'এমিলি' কে ভালবাসে আর এমিলি জর্জ্জকে দেখিলে রাগে, ক্রোধে জ্বলিয়া মরে। এত হীনতা স্বীকার করিতে জর্জ্জ রাজী নয়।

এমন সময় তাহারা ডাকঘরে যাইয়া উপস্থিত হইল। জর্জ্জের কোন আবশ্যকতা ছিল না—তত্রাচ সে পিতার কাছে তার করিল—'ভাল আছি, ব্যস্ত হইবেন না; মানসিক অবস্থাও ভাল।'

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। দারুণ যন্ত্রণায় জর্জ্জ মরিয়া যাইতেছিল। এক একটা দিন তাহার বুকের হাড় পিষিয়া দিয়া যাইতেছিল।

অভিমান উপহাস ভুলিয়া সে কি একদিন ফ্লোরার লাল দুখানি পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিবে—'প্রিয়তমে আমায় রক্ষা কর, আমি তোমার জন্য মরিয়া যাইতেছি?'

অসম্ভব! সে যদি বলে, 'জর্জ্জ বাতুলতার পরিচয় দিও না। একটু নিজকে সংযত কর।' এ প্রকার অপমান অপেক্ষা মৃত্যু যে হাজার গুণে ভাল। ফ্রান্‌সিস্ বলিয়াছিল 'প্রেমের বাজারে একটু দীনতা স্বীকার না করিলে চলে না।' আচ্ছা, মাঝে মাঝে সুযোগ মত তাহার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে ত হয়। সে যদি আমাকে একটু উৎসাহিত করে, তাহা হইলে আমিও ভাল করিয়া নিজকে প্রকাশ করিব।

পরক্ষণেই সে যেন একটু লজ্জিত হইয়া ভাবিল,—ফ্লোরা কি মহারাণী? আমি করুণার আশায় তাহার উপর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিব? অন্যে না জানুক, সে ত ভাবিবে 'জর্জ্জ আমার করুণাপ্রার্থী। সে আমার দিকে পাগলের মত চাহিয়া থাকে।' গৌরবে সে আরও চঞ্চল হইবে, সে চা পান করিবার সময় একটু জোরে আরও হাসিবে। আমার প্রাণের রক্ত একটা বালিকার হাসির জিনিস হইবে? পারিব না।

জর্জ্জ বইয়ের ঘরে বই দেখিতেছিল, আর এই সব কথা ভাবিতেছিল।

নীরস বইগুলিতে একটুও আনন্দ নাই। সে ছড়িখানা ও টুপীটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। দিব্যি ফুটফুটে জোছনা লতায় পাতায় পড়িয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্যদৃশ্য মেলিয়া দিয়াছে।

রোজাভিলার অনতিদূরেই সেতু। প্রাণের বেদনায় সে ইচ্ছা করিল একবার সেতুর উপর ঘুরিয়া আসে। যখন সে ঠিক রোজাভিলার সম্মুখে তখন আবেগে তাহার পা কাঁপিয়া উঠিল। চোখ দুটী জলে ভরিয়া গেল। ফ্লোরা এখন কি করিতেছে? সে হয়ত তাহার বালিকা-হৃদয় লইয়া ছোট ছোট ছেলেদের সহিত খেলা করিতেছে, কিংবা উঠানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, কিংবা তাহার চাচার কাছে খবরের কাগজ পড়িতেছে।

জর্জ্জ চাহিয়া দেখিল ফ্লোরার চাচা ঘরের মধ্যে একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া ধূমপান করিতেছেন। সে দাঁড়াইল না, বরাবর সেতুর দিকে চলিয়া গেল।

ছোট স্রোতস্বিনীর উপরে লোহার সেতু, দুই পার্শ্বে ফুটপাথ।

সেখানে ফ্রান্‌সিস্‌ ও ফ্লোরা দাঁড়াইয়া। জর্জ্জ একটু কেমন হইয়া গেল। তাহার বুকের মধ্যে যেন একখানা অতি ঠাণ্ডা বরফখণ্ডের স্পর্শ অনুভূত হইল।

ফ্লোরা ও ফ্রান্‌সিস্‌ এক সঙ্গে জর্জ্জকে অভিবাদন করিল।

ফ্লোরা কহিল,—মিষ্টার জর্জ্জ, আসুন, আসুন, এই সুন্দর রজনীতে বন্ধু বান্ধব লইয়া এই সুন্দর স্থানে সমস্ত রাত্রিটা কাটাইয়া দেওয়াও মন্দ নয়।

ফ্রান্‌সিস্‌ কহিল বেশী বন্ধু ভাল নয়। মাত্র দুই জন হইলেই যথেষ্ট।

ফ্রানসিসের কথায় কেহ উত্তর দিল না। এমন সময় সেখানে এমিলি

আসিয়া উপস্থিত হইল। এমিলি ষোড়শী, সুন্দরী ও যুবতী। সকলেই অভিবাদন করিয়া মিস্ এমিলিকে অভ্যর্থনা করিলেন।

এমিলি একটু চাপা রকমের; বিশেষ চঞ্চলা নহে। সে মৃদু হাসিয়া শুধু কথায় ধন্যবাদ না জানাইয়া সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাইল।

জর্জ্জের ইচ্ছা হইতেছিল, ফ্লোরা তাহার হাত ধরিয়া কহে—এই দিব্যি রজনী, আমি ও তুমি কি সুন্দর—কি মধুর! কিন্তু সে এমিলির সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল।

এমিলি কহিল,—ফ্লোরা, তোমাকে ডাকিবার জন্য তোমাদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তুমি আগেই এখানে ফ্রান্সিসের সঙ্গে এসেছ, তা'ত জানি না। ইত্যাদি।

নিকটে একখানা লম্বা বেঞ্চ ছিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা বলা সুবিধাজনক নয় ভাবিয়া তাহারা সকলেই সেখানে উপবেশন করিল। এক পার্শ্বে ফ্রান্সিস্, তাহার পর ফ্লোরা, ফ্লোরার কাছে এমিলি এবং এবং সর্ব্বশেষে জর্জ্জ।

ফ্লোরা ফ্রান্সিস্ ও এমিলির সহিত কথা বলিতেছিল। জর্জ্জ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ভাবিল,—এই কুৎসিৎ বর্ব্বরটার ফ্লোরার সহিত এত কথা বলিবার কি অধিকার আছে? ফ্লোরা কি নিতান্ত মূর্খ মেয়ে? তাহার জানা উচিত, তার মত একটা সুন্দরী মেয়ে ঐ কুৎসিৎটার সহিত অত কথা বলিলে বা অমন করিয়া মিশিলে তাহার সম্মানের হানি হয়। এই ত আমার পার্শ্বে যায়গা আছে, এখানে আসিয়া বসিলেই পারে।

জর্জ্জ চুপ করিয়া থাকিল। সে নিম্নে স্রোতস্বিনীর দূর দৃশ্য পানে তাকাইয়াছিল, আবার খানিক আকাশের নীলিমা দেখিতেছিল। কি সুন্দর আকাশ—অনন্ত নক্ষত্র, সীমাহীন নীলিমা!

জর্জ্জের ইচ্ছা হইতেছিল, ফ্লোরাকে লইয়া সে ঐ বিরাট্ হিরকচূর্ণ-শোভিত মহাশূন্যে উড়িয়া যায়। ফ্লোরা তাহার কাছেই বসিয়া, তথাপি সে কথাটী পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেছে না! জর্জ্জের মনে হইতেছিল /ফ্লোরা ঐ চাঁদের আলোর মত সুন্দর, ঐ তারার মত উজ্জ্বল, বসন্তের বাতাসের মত নির্ম্মল, ফুলের মত পবিত্র ও গন্ধময়। মহারাণীর মত তাহার সর্ব্বাঙ্গ মহিমা ভরা। তাহার একবিন্দু হাসির মূল্য লক্ষ মুদ্রা।

প্রায় এক ঘন্টা অতিবাহিত হইলে ফ্রান্‌সিস্ তাহাদের নিকট সে দিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিল। জর্জ্জ তাহাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল কিন্তু ফ্রান্‌সিস্ সরলহৃদয়ে যথেষ্ট মিনতি প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিল।

বাহিরে ভদ্রতার জন্য ফ্রান্‌সিস্‌কে অপেক্ষা করিতে বলিলেও জর্জ্জ মনে মনে ইচ্ছা করিতেছিল, সে একা একা কিছুক্ষণ ফ্লোরার সহিত গল্প করে।

এমিলি কহিল,—'মিষ্টার জর্জ্জ! আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি এখন যাই, বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে বেড়াইলে মা রাগ করেন। অতঃপর ফ্লোরার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—বোন! এখন যাই!

ফ্লোরা কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল,—যাও, তোমরা নিতান্ত কচি মেয়ে কিনা, তাই বাড়ী হতে দু'দণ্ড বাইরে থাকলে তোমার মা মনে করবেন, মেয়ে নদীতে পড়েছে না আগুনে পুড়েছে। যাবে যাও।

অতঃপর ফ্লোরা জর্জ্জকে কহিল—মিষ্টার জর্জ্জ! আসুন, আমরা আজ রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত এখানেই থাকব। কি সুন্দর মহিমাভরা রজনী!

"আপনার অনুগ্রহ।" এই টুকু বলিয়াই জর্জ্জ অত্যন্ত লজ্জিত হইল।

"ছি, ছি! এত শীঘ্র, কথা নাই কিছু নাই, এমন থাপছাড়া কথাটা বলা কি ভাল হইল?" ভাবিতে ভাবিতে জর্জ্জ ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া পড়িল।

ফ্লোরা কিছুই লক্ষ্য করে নাই। লক্ষ্য করা ভাল ছিল কি মন্দ ছিল তাহা খোদা জানেন। সে শুধু কথা বলিয়া যাইতেছিল।

জর্জ্জও কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু কথার মধ্যেই সে ভাবিয়া লইতে চাহিতেছিল—সেই থাপছাড়া কথা দুটার অর্থ কতদূর গড়াইতে পারে। কোনও রকমে সে মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল—কথা দুটী ভদ্রতার জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। অতঃপর একটু আশ্বস্ত হইয়া সে উৎসাহের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল।

ফ্লোরা কহিল,—মিষ্টার জর্জ্জ! আগামী বৎসরেই বুঝি আপনার পাঠ শেষ হইবে?

"হাঁ! মিস্ ফ্লোরা।"

"আপনার বোধ হয় বড় অসুখ?"

"আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন।"

"আহা! আপনি এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন। আপনি এখন পড়া শুনা বাদ দিন।"

"এখন অনেক ভাল আছি।"

"হবেন বৈকি। আপনার বুঝি mental deprission ওটা কিছু নয়। ভাল ও চিন্তাশীল লোকদেরই মন খারাপ হয়। মূর্খের সব সময়েই আনন্দ। তবে বেশী আনন্দও ভাল নয়। বেশী মন খারাপ হওয়াও ভাল নয়।"

জর্জ্জের ইচ্ছা হইতেছিল—সে একবার সেই নির্জ্জনতার মাঝে দৌড়াইয়া গিয়া ফ্লোরার পা জড়াইয়া ধরে। সে কাঁদিয়া তাহার কাছে

তাহার প্রাণের সমস্ত ব্যথা নিবেদন করে। বড় কষ্ট, বড় জ্বালা। সে রাণী ফ্লোরার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া বলে "ফ্লোরা, আমি মরিয়া যাইতেছি। আজ যেমন এই নির্জ্জন নদীর উপর, জ্যোছনাহসিত নৈশ গগনতলে আমার পার্শ্বে বসিয়া কথা বলিতেছ, এমনি করিয়া তুমি সারা জীবন আমার সহিত কথা বলিও।"

পরক্ষণেই অভিমান তাহার মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—সে ভাবিল, ছি, ছি, এত ঘৃণিত আমি! আমি কি একটা সম্মান-জ্ঞানহীন ক্ষুধিত বালক! আমি কি একটা ভিক্ষুক! আমি তাহার পা ধরিয়া কাঁদিতে চাহিতেছি—সে যদি পা সরাইয়া লয়, তাহা হইলে কি হইবে! আমি নিতান্তই ঘৃণিত! আমি তুচ্ছ! আমি না ডাবলিন কলেজের ছাত্র! কত আমার বন্ধু! আমি আজ এই নির্জ্জনে, চাঁদের আলোতে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া, একটা সামান্য গ্রাম্য বোকা মেয়ের সম্মুখে কি না কাঁদিয়া অস্থির হইতে যাইব? জ্ঞান-গম্ভীর, মিষ্টার জর্জ্জের চোখে অশ্রুজল! তা হ'তে পারে না।

জর্জ্জ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ফ্লোরা কি বলিতেছিল। সে কথা সে আদৌ শুনে নাই।

এই আকস্মিক অভদ্রতার পরিচয় দিয়া জর্জ্জ একটু লজ্জিত না হইয়া পারিল না। সে তাড়াতাড়ি মিস্ ফ্লোরার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল,—মিস্ ফ্লোরা! আপনার কথা শুনিতে শুনিতে আমার একটা দৃশ্য মনে হইল। সে দৃশ্যটা মনে আসিলে এখনও আমার হাসি আসে।

মিস্ ফ্লোরা আগ্রহের সহিত কহিলেন,—কি দৃশ্য মিষ্টার জর্জ্জ? আমাকে একটু বলিবেন কি?

জর্জ্জ কি বলিবে বুঝিতে পারিতেছিল না। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া

ফেলিল—"বলিব বইকি। আমি একখানা বইতে পড়েছি, এক বালিকার সম্মুখে জানু পাতিয়া এক অধ্যাপক ভালবাসার মহিমা বর্ণনা করিতে-ছিলেন,—কুমারীর করুণা ভিক্ষা করিতেছিলেন। যখনই এ দৃশ্যটী আমার কল্পনার চক্ষে ভাসিয়া উঠে তখনই আমি না হাসিয়া থাকিতে পারি না।

ফ্লোরা কহিল—অধ্যাপক দেখিতে বড় কুৎসিৎ ছিলেন বুঝি?

* * * *

রাত্রি বারটার সময় পর্য্যন্ত জর্জ্জের মা জর্জ্জের জন্য কামরায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। বৃদ্ধার বয়স প্রায় আশি বৎসর হইবে। চোখে চশমা দিয়া তিনি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় দরজা ঠেলিয়া ধীরে ধীরে জর্জ্জ ঘরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা একটু কৃত্রিম ক্রোধে বলিলেন,—এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?

"সেতুর উপর ফ্লোরার সহিত গল্প করিতেছিলাম।"

মা বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিতে যাইবার সময় গম্ভীর ভাবে বলিয়া গেলেন,—ফ্লোরার সহিত বড় মিশিও না। সে একটা বেহায়া মেয়ে, নইলে পঁচিশজন বর তাকে বে করবার জন্য পাগল হতো না। মিশতে হয় তো এমিলির সঙ্গে মিশো। এমিলি দিব্যি সুন্দরী মেয়ে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

ফ্লোরা আজ বেড়াইতে যায় নাই। ছাদের উপর ইজি চেয়ারে শুইয়া সে দূর গ্রামপানে চাহিয়াছিল।

সে ভাবিতেছিল—আমি বড় কুৎসিৎ। কেন যোশেফকে ভালবাসার কথা বলিয়া বিরক্ত করিব? সে তাহারি মত কোন সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করিয়া সুখী হউক। তাহার সহিত আমার কথা না বলাই ভাল।

চাচার সম্মুখে কেমন করিয়া কোন যুবককে ভালবাসিব? তিনি কি আমার ভালবাসা দেখিতে পারেন? আমার যে একটি প্রাণ আছে, মানুষ শুধু ভাত খাইয়া বাঁচিতে পারে না, আমি একটি যুবককে ভালবাসিতে চাই—এটা কি তিনি বুঝেন না? তিনি তাঁহার বাল্যকালের কথা ভাবিয়া দেখিলে ত পারেন। তিনি কি কোন কালে যুবক ছিলেন না? তাঁহার বৃদ্ধহৃদয়ের নীরসতা ও বৈরাগ্য লইয়া যুবক-যুবতীর প্রাণ গঠিত হয় কি?

যাক সে কথা, কল্পনায়ও চাচার নিন্দা করিব না। তাহাতে পাপ হইবে।

মরিবার সময় মা আমার হাতখানা চাচা ও চাচীর হাতে রাখিয়া বলিয়াছিলেন—তোমার চাচা চাচির কথা শুনিও।

আমি পাপ করিতেছি, কেন যোশেফের কথা ভাবিতেছি? চাচা চাচী তো অনুমতি দেন নাই। চাচা বলেন—আমি হতভাগিনী, আমার

পেট মোটা, আমার গাল ফোলা। আমি কুৎসিৎ। চুলগুলি ঘোড়ার লেজের মত। তিনি কি মিথ্যা বলেন? তিনি মিথ্যা বা'লে নিশ্চয়ই অমন করিয়া গম্ভীর হইয়া বা অতবার বলিতে পারিতেন না।

আমার পক্ষে যোশেফকে ভালবাসিতে যাওয়া ভাল হয় নাই। দাঁড় কাকের আবার ময়ূরপুচ্ছ পরিবার সাধ কেন? উহা অন্যায় বাড়াবাড়ি হইবে। উহাতে আমার পাপ হইবে। ঈশ্বরের কাছে আমি অপরাধী হইব।

যে সব পাগলেরা আমাকে ভালবাসে—তাহারা নিতান্তই হতভাগ্য! তাহাদের কি সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার চোখ নাই? যোশেফের সৌন্দর্য্য কি তাহারা দেখে নাই? তাহার কাছে আমি কি? আমি ত তুলনায় তাহার কাছে একটা নিতান্ত অপদার্থ!

যোশেফ রাজা—আমি ভিখারিণী—আমি দাসী।

আচ্ছা যোশেফকে যদি বলি—তুমি আমাকে মাত্র তোমার কাছে থাকিবার অনুমতি দাও। তুমি কোথায়ও বিবাহ কর—আমি তোমাদের বাড়ীতে থাকিব মাত্র।—

না, না, তাও কি কখনো হয়। স্থির জলে ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ফেলিয়া দিলে উহা যেমন কাঁপিয়া উঠে, প্রেমিক-প্রেমিকার শান্ত সুখের জীবনে সেইরূপ কোনও প্রকার বাধা আসা বাঞ্ছনীয় নহে।

যোশেফ বিবাহ করুক। আমি কেন বাহির হইতে তাহার শান্তিময় জীবনে অশান্তি আনিব? আমার কি অধিকার আছে?

কোথায় জীবন-নদীর নীল জলে, তীরে দাঁড়িয়ে আকুল নেত্রে স্রোতের দিকে ফুলের সাজি কক্ষে নিয়ে যোশেফের আশায় সকাল বেলা কোন পথিকা চাহিয়া আছে, তা কে জানে? আমি কোন্ সাহসে জোর করিয়া পথিকার জীবন-দেবতাকে কাড়িয়া লইব?

কাড়িয়া লইবার ক্ষমতাই বা আমার কই? চাঁদের জন্য শিশু-বালিকার মত কাঁদাকাঁদি করিলে কি হইবে?

যোশেফের সম্মুখে যাওয়া আমার পক্ষে পাপ। যে দিন তাহাকে প্রথম দেখি, সে দিন অতক্ষণ ধরিয়া অমন করিয়া তাহাকে দেখা আমার ঠিক হয় নাই। তারপর মনের ভিতর জোর করিয়া একটা দৃঢ়তা আনিয়া সে কহিল—তাহার সম্মুখে যাইব না। তাহার সহিত আর কথা বলিব না। প্রেম তাহাকে মধুর করুক। সে বড় হইয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করুক। এমন সময় ছোট কাজিন * তাহাকে ডাকিল। ফ্লোরা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। তার চাচী তাহাকে দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় ছিলি?

ফ্লোরা কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—একটু উপরে বসিয়াছিলাম।

'কেন, উপরে বসিয়া থাকিবার আবশ্যকতা কি? বাড়ীতে কি কোন কাজ নাই?'

ফ্লোরা মাথা নোয়াইয়া দিল। তাহার চাচী আবার বলিলেন—খোকার পিঠে নূতন উপসর্গ উপস্থিত হলো; ডাক্তার যে নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করেছেন, সেট তোমাকে বিকেলেই ত আনতে বলা হয়েছে।

ফ্লোরা অত্যন্ত লজ্জিত হইল। সে চাচীর কাছে 'যাইতেছি' বলিয়া একটু বাহিরে গিয়াছিল, সেখানে যাইয়া মিষ্টার উ-ইড্-লির কন্যা লিলির সহিত কথা বলিতে বলিতে ঔষধ আনবার কথা সে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। নিজকে শতবার অপদার্থ মনে করিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কহিল,—'লিলির সহিত কথা বলিতে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি এখনই যাচ্ছি।'

---

* চাচার ছেলে।

"এখন ত যাবে। অমন করেই তুমি সব ভুলে যাও।"

ফে্ারার চাচা ঘরের মধ্যে বসিয়া কাগজ পড়িতেছিলেন। তিনি কহিলেন—ভুলবে না কেন? আজ কাল একা একা কাল কাটাতে শিখেছে! সেয়ানা মেয়ে, মনে এখন কত কথা ভেসে উঠে!

ফে্ারা স্তম্ভিত হইল। সে ভাবিল,—চাচা কি পাগল হইয়াছেন? তিনি কেমন করিয়া এমন কথা বল্লেন? এমন লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা কোনো চাচার মুখে শোভা পায়? আমি কি এতই উপহাসের পাত্র? যে কথাটা একটি মানুষের বুকের রক্ত জল করিয়া দেয়, সে কথাটা শুনিয়া কে হাসিতে পারে?

সে তাড়াতাড়ি শিশিটা লইয়া অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার হৃদয় চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল, সে অতি কষ্টে চাচা ও চাচীর সম্মুখে চোখের জল চাপিয়া রাখিয়াছিল। আঁধারে একাকী সে রাস্তা অতিক্রম করিতেছিল আর অনবরত তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।

তাহার বাবা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন, তিনি কি এমন নিষ্ঠুর কথাটা এত সহজে বলিয়া ফেলিতে পারিতেন? তার জন্মাবার আগেই তার বাবা মরে গিয়েছেন। সে ভাবিল, সকলেরই বাবা আছে, কেবল তারই বাবা ছিল না। একবারও সে জীবনে 'বাবা' বলিয়া প্রাণে কেমন সুখ হয়, বুঝিতে পারে নাই। জন্মাবধি সে কখনো বাবার কথা মনে করিয়া বেদনা অনুভব করে নাই, আজ তাহার অত্যন্ত শূন্যতা বোধ হইতে লাগিল। সে শিশুর মত 'বাবা বাব.' বলিয়া পথের মাঝে কাঁদিয়া উঠিল।

তারপর তাহার মায়ের রোগশীর্ণ মুখখানির কথা মনে পড়িল। তাহার জন্মই নাকি তাহার মায়ের রুগ্নতার কারণ।

সে তাহার সহোদর সেমেরার সহিত মায়ের বিছানার পার্শ্বে কত

রাত্রি না খাইয়া না ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিয়াছে। তবুও জননী তাহাদের বাঁচিলেন না। এক দিন শেষরাত্রে তাহার ভগ্নীর কোলের উপর মাথা দিয়া তাহার গায়ের উপর শীর্ণ শাদা শাদা রক্তহীন হাতখানি রাখিয়া চিরকালের জন্য তাহাদের জননী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। সে আর একটীবারও তাহার মাকে দেখিতে পাইবে না ?

মায়ের কথা মনে হওয়াতে সে আবার নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বেদনা ও আঁখিজলের ভিতর ফ্লোরা প্রতিজ্ঞা করিল—সেয়ানা হওয়া যদি অন্যায় হয়, কাহারও কথা ভাবা যদি দোষের হয়, তবে সে সেই দিন হইতে আর কাহারও কথা ভাবিবে না। সেয়ানা হওয়াটা সে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০০০—

ফ্লোরা ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মুখে তাহার বেদনার চিহ্নমাত্র নাই। স্বাভাবিক প্রশান্তভাব তাহার স্বর্গীয় মুখখানিতে প্রতিভাত হইতেছিল। সে ঔষধের শিশিটী সেল্ফের উপর রাখিয়া রুগ্ন ভাইটীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। রুবী বলিল, 'দিদি ঔষধটা এনেছ ?'

ফ্লোরা বলিল, "এনেছি ভাই, তুমি একটু পাশ ফিরে শোও। আমি ধীরে ধীরে মালিস করিয়া দেই।"

রুবী পাশ ফিরিয়া শুইল। ফ্লোরা তাহার পিঠের বেদনাস্থানে ধীরে ধীরে ঔষধ মালিস করিয়া দিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রুবী অনেকক্ষণ পরে বলিল, দিদি! মানুষ মরিয়া কোথায় যায়?

ফ্লোরা বলিল,—'ছি ভাই, রাত্রিকালে মৃত্যুর কথা বল্‌তে নাই; তোমার কষ্ট হবে।'

"না দিদি! আমার কোন কষ্ট হবে না। আমার মৃত্যুর কথা শুনতে ভয় হয় না। মৃত্যুর কথা ভুলে গেলেই ত মানুষ সহজে পাপ করিতে পারে। মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যই ত আমাদের যীশু মানুষের ঘরে রোগ পাঠিয়ে দেন। মানুষ সুস্থ শরীরে হাসিয়া খেলিয়া জোর করিয়া বিশ্বাস করিয়া লয়—সে কখনো মরিবে না, সে চিরকালই মাথা উঁচু করিয়া থাকিবে। যদি মৃত্যুর কথা আমরা ভাবি, তা হ'লে কি আমরা এত পাপ করিতে পারি। আমরা জোর করিয়া, বড় করিয়া এত কথা বলিতে পারি?"

"তুমি যা বলছ ঠিক। ভগবান্ ব্যথা দিয়ে, আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেন। সুতরাং ব্যথার, দুঃখের কারণ বড় বেশী নাই।"

"তুমি ঠিক কথা বল্‌ছে দিদি। আচ্ছা আমি যা বলছিলেম,—আচ্ছা মানুষ মরিয়া কোথায় যায়?"

ফ্লোরা বলিল,—পণ্ডিতেরা বলেন—'মানুষ মরিয়া আপনার দেশে চলিয়া যায়। সে যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরিয়া যায়।'

পার্শ্বের ঘরে বসিয়া ফ্লোরার চাচী কি লেখা পড়া করিতেছিলেন। তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন—কুকথা বলিয়া ওর মাথাটা খারাপ করা হচ্ছে কেন? আর এই বুঝি জন্ম-মৃত্যুর আলোচনার সময়?

রুবী ও ফ্লোরা চুপ করিল।

* * * * *

রাত্রি তখন তিনটা। ফ্লোরা রুগ্ন ভাইয়ের পার্শ্বে একখানা আরাম-

কেদারায় হেলান দিয়া ঘড়িটার দিকে চাহিয়া ছিল। কাছে ঔষধের শিশিগুলি। দুই ঘণ্টা পর পর ঔষধ খাওয়ান হইতেছিল। মাঝে মাঝে দু'মিনিট, তিন মিনিটের জন্য তাহার চোখে একটু তন্দ্রা আসিতেছিল, আবার সে ব্যস্ত হইয়া ঘড়ির দিকে তাকাইতেছিল। সে রাত্রি বারটা পর্যান্ত রুবীর পাশে বসিয়াছিল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রুবীর বার বার অনুরোধে সে একটু আরাম-কেদারায় হেলান দিতে বাধ্য হইয়াছে।

পার্শ্বের ঘরে রুবীর মা ঘুমাইতেছিলেন। রুবীর একটু উঠিবার আবশ্যক হইল। সে একটু চোখ খুলিয়া দেখিল, তাহার দিদি চোখ বুজিয়া আছেন।

সে ভাবিল—এই রাত্রি প্রায় একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া দিদি একটু ঘুমাইয়াছেন। কেমন করিয়া ডাকিব ?

সে এপাশ ওপাশ করিতেছিল, তত্রাচ ফ্লোরাকে ডাকিতে পারিতেছিল না। সে ত দিদিকে অনেক কষ্ট দিয়াছে, অতএব আর একটু দিতে বাধা কি ? তবুও সে পারিতেছিল না।'

ফ্লোরা যেন ঘুমের মধ্যেই বুঝিয়া লইল, রুবীর একবার বাহিরে যাওয়া আবশ্যক। সে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—রুবী কেমন আছ ?

রুবী বলিল,—দিদি ! আমি একবার বাহিরে যাব। ফ্লোরা তাড়াতাড়ি কেদারা ছাড়িয়া রুবীকে ধীরে ধীরে উঠাইল।

বাহির হইতে আসবার সময় হঠাৎ দরজায় আঘাত লাগিয়া ফ্লোরা পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে রুবীও নিকটস্থ একটা কাচপাত্রের উপর পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া ফ্লোরার চাচী ও চাচা দৌড়াইয়া আসিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তাহার চাচী কহিলেন—এত বড় হাতীর মত মেয়ে তুমি! রোগা ছেলেটাকে ফেলিয়া দিলে ইহার ফল কত খারাপ হইবে তা জান?

ফোরা লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। অবশ্য তাহারি অসাবধানতার জন্য রুবী পড়িয়া গিয়াছে। সে নিজে মাথায় ভয়ানক আঘাত পাইয়াছে, সে কথা সে মোটেই ভাবিল না।

রুবী যখন তাহার মায়ের বাহুর উপর তখন সে অত্যন্ত ছোট স্বরে তাহার কুণ্ঠিত ও লজ্জিত দিদির জন্য বলিল,—মা; দিদির কোন দোষ নাই, দিদি সমস্ত রাত্রি ঘুমায় নাই।

রুবীর বাবা কহিলেন,—সমস্ত রাত্রি ঘুমায় নাই বলে কি একটা তিন মাসের রোগীকে এমন করে ফেলে দেয়? ওর যদি ইচ্ছা না হয়, তবে আমাদিগকে উঠাইয়া দিলেইতো হইত। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি ফোরার মুখে এক প্রচণ্ড আঘাত করিলেন।

ইহার পর ফোরা তিন দিন জ্বরে পড়িয়া থাকিল। এই তিন দিন একটী লোকও তাহার কাছে আসিয়া একটা মধুর কথা বলিল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—*:0:*—

শুক্রবার। অদ্য গ্রাম্য সভা। পনর দিন পরে এই সভা বসিত। এমিলি, যোশেফ, ফ্রান্সিস্, লিলি ও জর্জ্জ সকলেই সেখানে গিয়াছেন, কেবল ফ্লোরা যায় নাই। গ্রামের অন্যান্য সদস্যও আসিয়াছিলেন।

ফ্রান্সিসের প্রস্তাব মত মিস্ লিলি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার আলোচ্য বিষয়—"গ্রাম্য নিঃসহায় বিধবা ও কঠিন কার্য্যে অক্ষম ব্যক্তিগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণ।"

মিস্ লিলির আজ্ঞাক্রমে মিষ্টার জর্জ্জ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—গ্রামে যে সব বিধবা ও অক্ষম ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে হইলে ধনী পরিবারদিগকে কিছু ব্যয় করিতে হইবে। গ্রামে একটা সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হউক।

যোশেফ উঠিয়া বলিলেন—এমন অনেক ভদ্রমহিলা ও ভদ্রপরিবার আছেন, যাঁহারা নিতান্ত কষ্টে পড়িলেও কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতে অপমান বোধ করেন। এমন কোন উপায় অবলম্বিত হউক যাহাতে কাহারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট না হয় কিংবা কেহ আপনাকে কৃপার পাত্র মনে না করেন।

জর্জ্জ বলিলেন—আমি প্রস্তাব করি, ঘরে বসিয়া কাজ করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্র ক্রয় করিয়া দেওয়া হউক। প্রস্তুত দ্রব্য উপযুক্ত মূল্য ধার্য্য করিয়া সমিতি গ্রহণ করিবেন এবং মাসে মাসে প্রাপ্য টাকা হইতে

যন্ত্রের দাম কিছু কিছু করিয়া কাটিয়া রাখা হইবে। সংগৃহীত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যাহা হইবে তাহা সদস্যগণের মধ্যে সমান ভাবে বিভক্ত হইবে।

লিলির পিতা বলিলেন—আমি এই কার্য্যের জন্য একশত পাউণ্ড দিতে প্রস্তুত আছি। ডাবলিন হইতে একজন দর্জী ও একজন মিস্ত্রী আনা হউক। তাঁহারা আমাদের কাহাকেও কর্ম্ম শিখাইয়া যাইবেন, আমরা আবার প্রয়োজন মত সকলকে শিক্ষা দিব।

আর একটি বিভাগ থাকিবে, যেখানে আমাদের ইচ্ছামত সময়ে যাইয়া যতটুকু সময় পারি—কার্য্য করিব। উপার্জ্জিত অর্থ জমা থাকিবে এবং উহা কোন সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে।

মেয়েরা বাড়ীতে বসিয়া নানা প্রকার কার্য্য করিতে পারেন। অপরের অনুগ্রহে বাচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। তাহাদিগকে যাহাতে স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার সুযোগ দেওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা আমাদের কর্ত্তব্য। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, যুবক বৃদ্ধ সকলেই অবসর সময়ে সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন। দ্রব্য ভাল হইলে সামান্য বালকের পরিশ্রমজাত দ্রব্যও ক্রয় করিয়া রাখিতে পারা যায়।

অতঃপর এক সমিতি গঠিত হইল। ধনরক্ষক হইলেন বিনয়ী বৃদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণ লিলির পিতা।

ফ্রানসিস্ দুই শত টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন এবং আরও অন্যান্য সদস্যেরা সাধ্যমত অংশ ক্রয় করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সভা ভঙ্গ হইলে জর্জ্জ, লিলি, যোশেফ ও ফ্রানসিস্ গল্প করিতে লাগিলেন।

জর্জ্জ বলিলেন—মিষ্টার ফ্রানসিস্, চলুন আমরা কল্য একটু বেড়াইয়া

আসি। অনেকদিন বনভোজন হয় না। কল্য এক পিকনিক্-পার্টি হউক।

ফ্রানসিস্ খুব উৎসাহিত হইয়া বলিলেন,—বেশ কথা আমার খুব মত আছে। মিস্ লিলি কি বলেন ?

লিলি বলিলেন,—বেশ, সঙ্গে শিকারের সরঞ্জাম লইয়া গেলে বন-ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে একটু শিকারের আমোদও লাভ করা যায়।

ফ্রানসিস্ কহিলেন,—বেশ কথা বলিয়াছেন। আমি নিজে তিনটী বন্দুক ও দুটী কুকুর লইব, সঙ্গে দুটী ভৃত্য ও অন্যান্য জিনিস পত্র যাইবে। এমিলি বলিলেন—সঙ্গে ভৃত্য থাকিলে, বনভোজনের সব আমোদ নষ্ট হয়। যাহা লইবার দরকার নিজেরাই ঘাড়ে করিয়া লইবেন। আমোদ করিতে গিয়া আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করা হইবে। জর্জ্জ বলিলেন,—ঠিক কথা। আমি কোদাল, কেট্‌লী ও পাকপাত্র নিজেই লইব।

সকলেই আনন্দিত হইলেন।

যোশেফ ফ্লোরা আসেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কারণ বুঝিতে না পারিয়া সকলেই চিন্তিত হইলেন।

প্রাতঃকালে জর্জ্জ অন্যান্য বন্দোবস্তে ব্যস্ত থাকিবেন বলিয়া, ঠিক হইল মিষ্টার ফ্রানসিস, মিস্ ফ্লোরাকে সঙ্গে লইয়া কাউন্ট জঙ্গলাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

ফ্লোরা না গেলে বনভোজনের আনন্দ সম্পূর্ণ হইবে না একথা সকলে মনে মনে বুঝিলেও বাহিরে কেহ প্রকাশ করিলেন না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন অন্ধকার থাকিতে থাকিতে মিষ্টার যোশেফ, জর্জ্জ, এমিলি ও লিলি হাসি-কৌতুকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ফ্রান্সিস্ পশ্চাতে ফেয়ারাকে লইয়া আসিতেছেন।

মাউণ্ট জঙ্গল বেশী দূর নহে, প্রায় অৰ্দ্ধ মাইল দূরে। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই রাত্রির শেষ অন্ধকারটুকু চলিয়া গেল।

সম্মুখে মাঠ। মাঠের মধ্য দিয়া পাকা রাস্তা। মাঠের পার্শ্বেই মাউণ্ট জঙ্গল বা মাউণ্ট পর্ব্বত শ্রেণী। জঙ্গলে যাইবার জন্য বাঁধা পথ ছিল। তাঁহারা সেই পথ ধরিয়া যাইতেছিলেন। পথ খুব প্রশস্ত। সুতরাং কাহারো পশ্চাতে কেহ না থাকিয়া সকলেই এক সঙ্গে চলিতে পারিতেছিলেন। যোশেফের পার্শ্বে এমিলি, ও জর্জ্জের সঙ্গে লিলি।

জর্জ্জ কুকুর ডাকবার ছলে মাঝে মাঝে পশ্চাতে চাহিতেছিল এবং তৎসহ একটু সঙ্কোচ যে অনুভব করিতেছিল না, তাহা নহে। পাছে, তাহার বন্ধুরা মনে মনে প্রশ্ন করেন, এত আগ্রহের কারণ কি?

এমিলি ইচ্ছা করিতেছিল যোশেফ মাঝে মাঝে তাহার হাতখানা ধরে। সে ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইতেছিল না। কুমারী এমিলি ভিতরে ভিতরে একটু ব্যথা অনুভব করিতেছিল।

দূরে গাছের উপরে একটা ফজেণ্ট! * আহ্লাদে সকলেই নাচিয়া উঠিলেন। পাখিটী যেন তাঁহাদের জন্ম গাছের উপর বসিয়াছিল।

---

* ফেজেণ্ট—পক্ষীবিশেষ।

যোশেফ বলিলেন,—মিষ্টার জর্জ্জ আপনি ভাল শিকারী, আপনিই এটাকে হত্যা করুন।

জর্জ্জ বলিলেন,—না, আপনিই ভাল শিকারী। উভয়ের মধ্যে বিনয়ের বাদানুবাদ চলিতে লাগিল—এমন সময় এমিলি বলিলেন,—'আপনারা চুপ করিয়া এখানে অপেক্ষা করুন, আমি ও লিলি শিকার করিব।

জর্জ্জ ও যোশেফ উভয়েই আনন্দিত হইলেন। এমিলি তামাসা করিয়া বলিয়াছিল। সে যোশেফের সঙ্গে কথা বলিবার সুবিধা পায় নাই। এই অসম্ভব প্রস্তাব করিয়া সে একটু কথা বলিবার অবকাশ খুঁজিতেছিল।

যোশেফ বন্দুকটা এমিলির হাতে দিয়া কহিলেন, 'পাখী না মারিতে পারেন ক্ষতি নাই। ফ্রান্সিস্ গাড়ীতে যথেষ্ট হরিণ মাংস লইয়া আসিবে। আপনি চেষ্টা করুন।

এমিলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্দুকটা হাতে লইল। যোশেফ লক্ষ্য করিলেন এমিলির নিখুঁৎ মুখে রক্তিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং চঞ্চল চোখে অপূর্ব্ব শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে তবুও এমিলিকে ভালবাসিতে পারে না, সে এমিলির সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু মুগ্ধ হইতে পারে না। তাহার হৃদয়ের সমস্ত প্রণয় ধ্যান-নিরত যোগীর চিন্তাস্রোতের মত একমুখী হইয়া ফ্লোরার দিকে গড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ভালবাসা যেন পাহাড়ের মত স্থির,—বাতাসেও উহা বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। কাহারও নজরে উহা না পড়ে, তাহাতেও ক্ষতি নাই; উহা আপনার মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকিবে। বরফস্তূপের মত উহা গলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে না।

যোশেফের কাছে ফ্লোরা এক বিপুল রহস্য। সে যেন ইচ্ছা করিয়াই ধরা দেয় না। তাহাকে সে বহু চিন্তার দ্বারাও কিছু বুঝিতে পারে না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এমন সময় বন্দুকের শব্দ হইল। যোশেফ চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন এমিলির অব্যর্থ লক্ষ্য হইতে পাখী রক্ষা পায় নাই।

যোশেফ প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—মিস্ এমিলি! আপনি একজন বীর রমণী।

এমিলি কোন উত্তর দিতে পারিল না। যোশেফ তাহাকে বীর রমণী বলিয়া সম্বোধন করিতেছে! সে মনে মনে কহিল, 'যোশেফ তোমার মধুর মুখে 'বীর রমণী' শুনিয়া আজ আমি বড় মুগ্ধা হইলাম। তুমি ভুলিয়া আমার বালিকা-হৃদয় চূর্ণ করিও না।'

রমণীরা প্রাণের কথা সহজে বলিতে পারে না। হৃদয় তাহাদের জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। যে মুখে তুমি 'বীর-রমণী' কহিলে সেই মুখে তুমি একদিন 'প্রিয়তমে' বলিয়া কি আমার হাত ধরিবে না?

তাঁহারা আনন্দে কথা কহিতে কহিতে আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা পাহাড়ের উপর যাইয়া উপনীত হইলেন। পথশ্রমে তাঁহারা একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন সুতরাং গাছের ছায়া ও শীতল বাতাস বেশ মধুর বোধ হইতেছিল।

জর্জ্জ কহিল—মিষ্টার ফ্রান্সিস্ বড় দেরী করিতেছেন।

যোশেফ ও লিলি পাখীর পাখা নাড়িয়া দেখিল সেগুলি সোণার মত ঝক্‌ঝকে, টুপিতে পারিলে বেশ মানায়। লিলি সুন্দর একটা পালক তুলিয়া লইল। যোশেফ্ রহস্যচ্ছলে কহিল,—মিস্ এমিলি, আপনি একটা পরিয়া লউন। আপনি যেমন সুন্দরী, আপনার মস্তকে ইহা অতি সুন্দর দেখাইবে।

অতঃপর জর্জ্জের দিকে অনুমোদনের জন্য মুখ ফিরাইয়া যোশেফ কহিলেন—মিষ্টার জর্জ্জ! আমার কথা সত্য কি না?

মিস্ এমিলি জর্জ্জকে অবসর না দিয়াই বলিয়া উঠিল, 'খুব সত্য!'

যোশেফ এমিলির মাথায় একটা পালক গুজিয়া দিল।

মিস্ এমিলি চেষ্টা করিয়াও মুখের প্রশান্ততা রক্ষা করিতে পারিতেছিল না। সে হাসিবে কি গম্ভীর হইবে ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

এমিলি ভাবিতেছিল—যোশেফ কি তাহাকে অপ্রস্তুত করিতেছে?

যোশেফ হয় ত তাহাকে ভালবাসে, ভাল না বাসিলেও সে এমিলিকে একটু আদর করিয়া সন্তুষ্ট হয়। এমিলি আরও ভাবিল—ইহারই নাম হয়ত ভালবাসা—

এমিলি তাহার সমস্ত স্ফূর্ত্তি, সমস্ত চঞ্চলতা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে হারাইয়া ফেলিল। সে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া ইচ্ছা করিল, পালকটা টানিয়া সে দূরে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাহা হইলে যোশেফ কি মনে করিবে?

এমন সময় দূরে ফ্রান্সিসের গাড়ী দেখা গেল। এমিলি তাহার মৌনতা দূরে ফেলিয়া দিবার সুযোগ পাইয়া বলিয়া উঠিল—ঐ গাড়ী দেখা যায়, মিস্ ফ্লোরাকে লইয়া মিষ্টার ফ্রান্সিস্ এতক্ষণে আসিলেন।

অভ্যর্থনার জন্য বা বন্ধুহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রীতি লইয়া তাঁহারা নীচে নামিয়া রাস্তার মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

গাড়ী নিকটে আসিলে জর্জ্জ দেখিল, গাড়ীর মধ্যে ফ্লোরা নাই। সহসা জর্জ্জের মুখ একেবারে রক্তহীন হইয়া গেল।

ফ্রান্সিস্ কহিল—মিস্ ফ্লোরা আসিতে পারিলেন না। তাঁহার কাজিনের * বড় অসুখ।

জর্জ্জ ইচ্ছা করিতেছিল এই দণ্ডেই সে বাড়ী ফিরিয়া যায়। তাহার ইচ্ছা ছিল বনভোজন উপলক্ষ্য করিয়া সে ফ্লোরার সহিত আলাপ করিবার বাঁধহীন সুযোগ করিয়া লইবে; কিন্তু তাহা হইল না। এই নির্ম্মম আঘাত সহ্য করিবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সে অত্যন্ত ব্যথা পাইল।

সকলে উৎসাহে রাঁধিবার ব্যবস্থা করিলেন। ভৃত্যেরা স্থান পরিষ্কার করিয়া এবং কাঠ সংগ্রহ করিয়া দূরে গেল।

লিলি ও এমিলি রন্ধনভার লইলেন।

ফ্রান্সিস্, জর্জ্জ ও যোশেফ গল্পে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে আনন্দদান করিতে লাগিলেন।

*　　*　　*　　*

আহার প্রস্তুত হইল। সকলেই আহার করিল। জর্জ্জ খাইল না। সে অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহার সমস্ত খাদ্য কুকুরের সম্মুখে ঢালিয়া দিল।

লিলি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মিষ্টার জর্জ্জ, এ কি করিলেন?' হৃদয়ের বেদনায় অন্ধ হইয়া ফলাফলের কথা চিন্তা না করিয়া জর্জ্জ বলিয়া উঠল,—'ফ্লোরা আসে নাই!'

সকলে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। জর্জ্জ যখন বুঝিতে পারিল পাগলের মত সে নিজকে লজ্জার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে, তখন সে আর সেখানে দাঁড়াইল না। নিতান্ত বদখৎ একটা কারণ দেখাইয়া সে একাকী কাহারও প্রতীক্ষায় না দাঁড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

---

* কাজিন—চাচার ছেলে।

বাড়ী আসিয়া জর্জ্জ মনকে একটা মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়া লজ্জার বেদনা হইতে মুক্ত করিতে চাহিতেছিল। জর্জ্জ ভাবিতে লাগিল,—ফ্লোরা যখন শুনিবে, সে খায় নাই বলিয়া আমি খাই নাই, তখন সে নিশ্চয়ই আমার কাছে আসিবে। আমি যে তাহাকে এত ভালবাসি ইহা সে মোটেই জানে না। সে আসিয়া যখন তাহার অকৃত্রিম কুমারী-হৃদয়ের ভালবাসা জানাইবে, তখন লজ্জার পরিবর্ত্তে আমার হৃদয় অহঙ্কারে ভরিয়া উঠিবে। আমি ফ্লোরার স্বামী হইব। কোনও রকমে কথাটা প্রচার হইয়া ভালই হইয়াছে। ফ্লোরার ন্যায় সুন্দরীর ভালবাসা লাভ করা, কম গৌরবের কথা নহে।

কিন্তু তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, কেহ তাহাকে ভালবাসা জানাইতে আসিল না। কোন বন্ধু তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিল না। আলোকে সে পথে বাহির হইতে দারুণ লজ্জা বোধ করিতেছিল। এমন করিয়া নির্ম্মমের মত ভগবান্ তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিলেন। জর্জ্জ চিরকাল প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে সে কাহারও ধার ধারে না, কিন্তু আজ যে সে সামান্য এক বালিকার নিকট প্রকারান্তরে এত ছোট হইয়া গেল।

লজ্জায়, ঘৃণায় এবং অব্যক্ত যাতনায় সে পরদিন প্রাতঃকালে রাত্রি থাকিতে থাকিতে গৃহ পরিত্যাগ করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল না জীবনে আবার কখনো বাড়ী ফিরিয়া আসে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

দুই বৎসর পরেকার কথা। জর্জ্জ শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই দুই বৎসরের মধ্যে জর্জ্জ একটিবারও বাড়ী আসিবার নাম করে নাই।

পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া এই দীর্ঘ সময়ের পর তাহার ইচ্ছা হইল একবার সে বাড়ী যায়। জগতের কত কাজে কত নূতন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেও এই দীর্ঘ সময়ে সেই পুরাতন মানুষটী আর নাই। তার দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয় তাহার এ দিনে খুব উন্নত হইয়াছে। কাহাকেও দেখিয়া সে ভীত নহে। সে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক! যোশেফ ও ফ্রান্সিস্ তাহার কাছে নিশ্চয়ই কৃপার পাত্র। মা তাহাকে এখন ভাল-বাসার সঙ্গে সঙ্গে একটু সম্মান প্রদর্শন করিতে ভুলিবেন না। সে আরও ভাবিল—বাড়ী গেলে, গ্রাম্য পুরাতন লোকগুলির সহিত কথা কহিবার সময় তাহাকে সতর্ক হইতে হইবে। এবার আর বাড়ী যাইয়া সে বিশেষ চঞ্চলতার পরিচয় দিবে না। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বেশী করিয়া গম্ভীর হওয়া আবশ্যক।

তাহার পর ফ্লোরার কথা তাহার মনে হইল। নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মনে মনে কহিল,—আমি ছেলেমানুষ ছিলাম। একটা গ্রাম্য হাবা মেয়ের জন্য আমার মত শিক্ষিত লোকের এত অবমাননা সহ্য করা নিতান্তই জঘন্য। সে অতীত দিন চলিয়া গিয়াছে। ফ্লোরার সহিত যদি মিশিতে হয় তবে আর তাহা বন্ধুর মত হইবে না।

তাই একদিন সে কয়েকখানা মোটা মোটা ঝক্‌ঝকে বই লইয়া, বুকে ও চোখে-মুখে ডিগ্রার দেমাক্ হানিয়া, পিতার কাছে বিদায় লইয়া গম্ভীর ভাবে বাড়ীর পথে যাত্রা করিল।

তখন বৈকাল বেলা। সে এতক্ষণ পর্য্যন্তও গোঁফ জোড়ায় চাড়া দিয়া উৰ্দ্ধমুখী করিয়া রাখিয়াছিল। গ্রামের বাতাস লাগিবামাত্র অজ্ঞাতসারে শ্মশ্রুর মাথা দুইটা নাচের দিকে নামাইয়া দিল!

সে নিজকে ধিক্কার দিতে লাগিল! সে একজন শিক্ষিত লোক। তাহার পক্ষে কতকগুলি গ্রাম্য অৰ্দ্ধশিক্ষিত লোকের কাছে এরূপ সঙ্কোচ বোধ করা বড়ই লজ্জাজনক! দেশ বিদেশের নানা ভদ্রলোকের সহিত তাহার আলাপ। কথায় ও কাজে তাহাকে এখন পূর্ণ গাম্ভীর্য্য রক্ষা করাই সুন্দর! তার একটা ব্যক্তিত্ব আছেই!

এমন সময় রাস্তার মোড়ে যোশেফ দাঁড়াইয়াছিল। যোশেফকে দেখিয়া জৰ্জ্জ বন্ধুজনোচিত সরলতাময় আনন্দ-উদ্বেগহৃদয়ে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং ওষ্ঠে স্বাভাবিক হাসি মাখিয়া যোশেফের কর মৰ্দ্দন করিল। যোশেফ অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহার সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

জৰ্জ্জ পরক্ষণেই অনুতপ্ত হইল। সে মনে মনে ভাবিল, এত চাপল্যের পরিচয় দিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়া কি তার ভাল হইয়াছে? যোশেফ পুরাণ কালের মতই সহজভাবে তাহার সহিত কথা বলিতেছে। তার এই দীর্ঘ দুই বৎসরের পরিশ্রমের কি একটুও মর্য্যাদা নাই।

তাহার পর সে মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিল—যোশেফ্ শিক্ষিত লোক নহে। সে ভদ্রতার কি জানে? উচ্চ জ্ঞানের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই।

সে আবার অনুতপ্ত হইয়া ভাবিল,—যোশেফকে এত বাহাদুরীর সহিত কথা বলিবার সুযোগ দেওয়া ভাল হয় নাই। গাড়ীর মধ্য হইতেই গম্ভীর ভাবে অল্প কথায় জিজ্ঞাসা করিলেই হইত—মিষ্টার যোশেফ! কেমন আছ?

জর্জ্জ স্বীয় গরিমা প্রকাশ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। মাঝে মাঝে সে বাছা বাছা শব্দ দিয়া কথার বাঁধুনী ও গাঁথুনীর দিকে খেয়াল রাখিয়া ল্যাটিন বলিতেছিল। তার চোখ মুখ তখন বিজয়ানন্দে উজ্জ্বল। তার স্বর অস্পষ্ট—অন্যমনস্কতা ও ঈষৎ ঔদাসিন্য মাখান। সে মাঝে মাঝে যোশেফের কথার উত্তর দিতেছিল না। তার বিশ্বাস, গুরুত্ব জানাইবার ইহাও এক পথ।

জর্জ্জ অপেক্ষাকৃত কম উৎসাহের সহিত যোশেফের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

খানিক দূর আসিলেই বৃদ্ধ মিষ্টার পানার অভ্যাসমত অনেক দিনের পর তার পরিচিত জর্জ্জকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—মিষ্টার জেনী, মিষ্টার জেনী! এই বুঝি ডাবলিন থেকে আসছ?

জর্জ্জের মাথা জ্বলিয়া গেল। ব্যাটা বুড়ো গর্দ্দভের সহিত তাহার ত কোন রক্তের সম্বন্ধ ছিল না। সে অমন করিয়া সম্বোধন করিবার কে? ভাবিতে ভাবিতে ফ্রোয়াদের বাটীর সম্মুখে যখন সে আসিল তখন তাহার চোখ মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

যখন সে বাড়ীর বহিরঙ্গনে যাইয়া নামিল তখন হৃদয়ে তাহার দারুণ অনুতাপ। সে ভাবিতেছিল 'আমি বিখ্যাত ডাক্তার ষ্টুয়ার্ট হান্‌টলের পুত্র জর্জ্জ হান্‌টলে স্কয়ার এম, এস, সি। আমার হৃদয়ে বল নাই! সামান্য বালকের মত আমার মন দুর্ব্বল!'

* * *

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

——:•:——

বসন্তের মৃদু মধুর বাতাস আসিয়া জর্জ্জের ললাটে লাগিতেছিল। তখন অনেক রাত্রি!

নানা চিন্তা আসিয়া তাহার মর্ম্মের দীনতার কথা বলিয়া যাইতেছিল।

সে ভাবিত 'ফ্লোরার এখনও বিবাহ হয় নাই কি? কে তাহাকে বিবাহ করিবে?'

ফ্লোরার কথা কেন আবার সে চিন্তা করিতেছে? সে নিজকে ধিক্কার দিল।

প্রেম-মদিরার গন্ধ যে পাইয়াছে তাহার অভিমান ও অহঙ্কার কোথায় থাকে? সে অভিমান বজায় রাখিতে পারে না; বাঞ্ছিতের পায়ের তলে সে শুইয়া পড়ে।

ইরাণের কবি বলিয়াছেন, প্রেমের বাজার হইতে কাপুরুষের মত পলায়ন করিও না। প্রেম পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা করিতে যাইও না। প্রেম তোমার অন্তরকে মহিমাময় করিয়া তুলিবে। যেখানে প্রেম নাই সেখানে অন্ধতা। এলাহী যুবতীর বেশে অলস লাস্যে যুবককে পাগল করেন, তিনি মাতার মহিমায় ঘুরিয়া বেড়ান, তিনি শিশু হইয়া হাসিয়া উঠেন।

জর্জ্জের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে কিছুতেই চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। মনকে সে বলিতেছিল, 'আমি ফ্লোরার সহিত কথা বলিব না। কেবল তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে পথের উপর দিয়া একটু বেড়াইয়া আসি।'

জর্জ্জের স্বভাবতঃ বড় ঘুম হয় না, তাহাতে আজ আবার মোটেই হয় নাই। রাত্রির দ্বিযাম অতীত হইয়া গিয়াছে। সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে রাস্তায় বাহির হইল। কোথায় তার প্রতিজ্ঞা আর অহঙ্কার ?

নিস্তব্ধ মৌন বিশ্বে তখন কেবল শাঁ শাঁ শব্দ। স্বপ্নের মধ্যেও কি জর্জ্জ ফ্লোরার সহিত একটু কথা বলিয়া আসিতে পারে না। কেন পারে না ? হঠাৎ তাহার ইচ্ছা হইল আত্মাকে সে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু সে যে অসম্ভব।

কিন্তু একি ভয়ানক চিন্তা ?—জর্জ্জ ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া সে ফ্লোরাকে জানাইবে, দেহটী তাহার দূরে থাকিলেও আত্মা তাহার পৃথিবীর সমস্ত দীনতা লইয়া ফ্লোরার চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। বাহিরে সে অভিমান বজায় রাখিতেছে, পাগল অবুঝ অন্তর তাহার, শিশুর মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া হয়রাণ হইয়া মরিতেছে। সে রাস্তার এক পার্শ্বে মুখ ঢাকিয়া বুক ধরিয়া বসিয়া পড়িল 'ওগো বালিকে! ওগো সুন্দরি, ওগো প্রিয়তমে, বাতাসগুলি তোমার কাণের কাছে আমার কথা কি বলে না ? তুমি আপন মনে, আপন ভাবে খেলিয়া বেড়াও। তোমার রক্তচরণ মাটীতে পড়ে কেন ? তুমি ফুলে ফুলে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও। তুমি অনুমতি দাও, কেবল আমাকে বল—সারা জীবন দূরে দূরে তোমার পিছনে পিছনে ঘুরিব। আর কিছু চাই না, কেবল তোমাকে চাই ; সমস্ত বিশ্ব, সমস্ত সম্পদ্ আমি বিসর্জ্জন দিব। তুমি অনুমতি দাও, সারাজীবন আমি তোমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিব।'

ফ্লোরাদের বাড়ীর কাছে রাস্তাটা ঘুরিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে সেতুর দিকে যাইবার ভাণ করিয়া সে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার মাথা

উঠিল না। সে চেষ্টা করিয়া একটিবারের জন্ত সেণ্টভিলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিল না।

সহসা একটা শব্দ জর্জ্জের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। সে থমকিয়া দাঁড়াইল। শব্দটী ফ্লোরাদের বড় ঘরের উত্তর পার্শ্ব-সংলগ্ন লতা পাতার ভিতর হইতে আসিতেছে।

সে স্থির হইয়া একটু আড়ালে দাঁড়াইল। সে অস্পষ্ট আলোকে দেখিল—একটা লোক, তাহার ঘাড়ে একখানা মই। জর্জ্জ চমকিয়া উঠিল। এত রাত্রে চোর ছাড়া কে ওখানে অমন করিয়া যায়।

ফ্লোরা উপর তালায় যে প্রকোষ্ঠে শোয় লোকটী ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠের জানালার পার্শ্বে মইয়ের অগ্রভাগ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

জর্জ্জ শিহরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নি ছুটিতে লাগিল। ফ্লোরাকে ক্ষণিক মোহে ভুলাইয়া সতীত্বনাশের চেষ্টা বুঝি? কি সর্ব্বনাশ! জর্জ্জ বাঁচিয়া থাকিতে সে এই দৃশ্য দেখিবে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ফটক পার হইয়া মইয়ের পাদদেশে যাইয়া উপস্থিত হইল, এবং উচ্চৈঃস্বরে 'চোর' 'চোর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে জর্জ্জকে লক্ষ্য করিয়া চোর উপর হইতে রিভলবার ছুড়িতে যাইতেছিল। জর্জ্জ সরিয়া দাঁড়াইয়া আবার প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল।

শব্দ শুনিয়া চারিদিক্ হইতে লোক জন ছুটিয়া আসিল। চোর আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিল না। সে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

ফ্লোরা বাতি ধরিয়া দেখিল—সে ফ্রান্‌সিস্! তখন জর্জ্জ ফ্লোরার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া!

* * * *

কয়েকদিন গিয়াছে, দুঃসহ যন্ত্রণায় জর্জ্জের প্রাণ জর্জ্জরিত!

এই দীর্ঘকাল বাড়ী হইতে দূরে থাকিয়া সে যে শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে তাহা কর্পূরের মত কোথায় উড়িয়া গেল! সে ভাবিল 'এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে মৃত্যু ভাল। এই ভয়ানক ঘটনার পর ফ্লোরা একবারও তাহার নিকট॰ আসিল না। এমন নির্ম্মম নিস্তব্ধতা কে সহিতে পারে? ফ্লোরা খুঁজিয়া দেখে না কেন, তাহার জন্য একজনের বুকের উপর দিয়া কি ব্যথার ঝড় বহিয়া যাইতেছে। বেদনা পাওয়া বেশী লজ্জাজনক, না— বেদনা দেওয়া বেশী লজ্জাজনক? জর্জ্জ তাহাকে বেশী কিছু না বলিলেও আসল কথা কি জানিতে কাহারো বাকি আছে? সে তাহার ভাব দেখিয়াও কি কিছু বুঝিতে পারে না?'

কাহার সম্মানের জন্য সে সেদিন নিজের জীবনকে সংশয়াপন্ন করিয়াছিল? ফ্লোরা তাহার কাছে একবারও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল না। একবারও সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না?

জীবন তাহার মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছিল। এক একটা দিন পাথরের মত। তাহার বুক পিষিয়া যাইতেছিল।

কয়েক দিন পরে একদিন সন্ধ্যাকালে জর্জ্জ জন্মের মত মটলীভ্যালী ছাড়িয়া গেল। তার ইচ্ছা এ জীবনে সে আর দেশে ফিরিয়া আসিবে না।

বহু বৎসর পরে ভারতবর্ষের কোন এক পল্লীপথে এক বৃদ্ধ পাদরীকে রাখাল বালকদিগের মুখে চুম্বন দিতে দেখা যাইত।

প্রতিদানে কোন কোন দুষ্ট বালক বলিত—পাদরী ত নয়, একটা বানর।

পাদরী শুধু হাসিতেন।

পাদরীর নাম রেভারেণ্ড ফাদার জর্জ্জ হানটলে স্কয়ার এম, এস, সি।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ফ্লোরা বুঝিতেই পারে নাই, তাহার মত সামান্য লোকের জন্য এত কিছু হইয়া যাইতেছে। সে বুঝিতে সাহস করে না, সকলেরই তাহার মত রক্তমাংসের শরীর। মনের ভাব সর্ব্বত্রই এক প্রকার। দুঃখ হইলে সকলেই কাঁদে। সকলেরই অনুভূতি আছে। সে পাগল নহে। সে 'কিছু না' নহে।

এমিলি নদীর পার্শ্বে বাঁধা ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া তার বাল্যবন্ধু ফ্লোরার হাত ধরিয়া কহিল,—ফ্লোরা কেমন আছ?

ফ্লোরা কহিল,—বেশ আছি, বোন্। তোমার মুখটা অত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? তুমি কিছু দিন হতে বড় শুকিয়া যাচ্ছো কেন বল দেখি?

তাহারা উভয়ে ঘাসের উপর উপবেশন করিল। তখন সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে।

ফ্লোরা আবার বলিল,—'এমিলি! সেবা-সমিতির কাজ কেমন চল্‌ছে। তুমি রোজই সেখানে যাও?'

'রোজ যেতে পারি না। তবে প্রায়ই যাই। দুই দিনে দুই ঘণ্টা কাজ করিয়া এক শিলিং উপায় করিতে পারি।'

'তোমার এ পর্য্যন্ত কত হয়েছে?'

'পনর টাকা মত। ত্রিশ টাকা হলে দরিদ্র মিঃ জনকে একটা রুটীর দোকান করে দেব। যথাসময় সে আবার টাকা ফেরত দিবে। আচ্ছা তোমাকে ত কখনো সেবাসমিতিতে যেতে দেখি না, তার মানে

কি ? তুমি ত কখনো কাহারো সহিত বেড়াতেও বাহির হও না। তোমার কি সেবাসমিতির কাজে সহানুভূতি নাই ? সেখানে অনেক কাগজ পত্রও আসে। অন্ততঃ কাগজপত্র পড়িবার জন্যও ত সেখানে যেতে পারো। আমি এ বছরে বহু বই পড়েছি। তুমি তোমার জ্ঞান বাড়াবার জন্য কি করেছো ?'

'আচ্ছা তুমি যে পরিশ্রম-অর্জ্জিত টাকা জনকে দিবে, সে যদি সেগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে তাহা হইলে কি হইবে ?'

'তাহাকে ইহার পর আর মূলধন রূপে কিছু দেওয়া হইবে না। যদি সে নষ্ট করিয়াই ফেলে, তাহা হইলেও বিশেষ দুঃখিত হইব না। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্যই টাকা দিব। হতভাগ্য উচ্ছৃঙ্খলতা দোষে যদি অবস্থার সচ্ছলতা সম্পাদনে অকৃতকার্য্য হয়, তবে তাহাকে সেবা-সমিতির কর্ম্মে যোগ দিতে বলা হইবে। যোগ্যতা অনুসারে দৈনিক পারিশ্রমিক সে পাইতে পারিবে।

আমার কোথাও না যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করছিলে—কারণ বিশেষ কিছু নাই।

কারণ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে কথা সে প্রকাশ করিল না, পাছে তাহাতে পাপ হয়। চাচার নিন্দা সে কিছুতেই করিবে না।

ফ্লোরা একটু চিন্তা করিয়া কহিল,—আমার এ সব কাজে সহানুভূতি নাই বলো কি ? পশু আত্মসুখে সুখী। মানুষ পরের সুখে সুখী বলিয়াই তার এত গৌরব। যে জাতীর মধ্যে যত এই ভাব প্রবল, তারা ততটুকু সভ্য। পরের জন্য যারা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে জানে না, তারা নিজেরাও কখনও বাঁচে না। তবে ঘরের খাইয়া একেবারে বনের মহিষ তাড়ান ভাল নহে। মানুষের স্ত্রী পুত্র ও পিতা মাতার প্রতিও কর্ত্তব্য আছে। তোমরা যাহা করিতেছ—ইহা অত্যন্ত প্রশংসার্হ। যদিও

আমি নিজে যাইতে পারি না, তত্রাচ আমার এ সব কাজে আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

'আমি তোমার কথা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। জ্ঞান বাড়াইবার কিছুই করিতেছি না। কেবল সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকি।'

এমিলি কহিল—'সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকাও কম গুণের কথা নয়। মেয়েমানুষ শুধু বিলাসের সামগ্রী নহে। সে স্বামীর সমস্ত কর্ম্মের সহায়তা করিবে। কিন্তু সহায়তার আবশ্যকতা না বুঝিলে সহায়তা করিবার প্রবৃত্তি হয় না। আবশ্যকতা বুঝিবার জন্য আবার স্বামীর সর্ব্ববিধ জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক। সেই জন্য স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা। একেবারে শুধু সে জন্যও নহে। জ্ঞানে মানুষের দৃষ্টি খুলিয়া দেয়। চর্ম্মচক্ষে পশুও দেখিতে পায়। মানুষের আত্মার দৃষ্টি ফুটান আবশ্যক। নচেৎ তাহার ধর্ম্মপালন সুসিদ্ধ হয় না। জ্ঞান ব্যতীত মানুষ পশু অপেক্ষাও ঘৃণিত। সে শিক্ষাহীন কুকুরের বিশ্বস্ততা, এবং মৌমাছির শ্রমশীলতারও অনুকরণ করিতে পারে না। হৃদয়ের মহাভাবগুলি ফুটাইয়া না তুলিতে পারিলে জীবনের কোন মূল্য নাই।'

'তোমার কথাগুলি বড়ই মধুর।'

এমিলি আবার কহিল,—'গ্রীসের মেয়েরা কত শ্রমশীলা ছিলেন। তাঁহারা নিজ হস্তে নদীতে কাপড় ধুইতেন, খাদ্য দ্রব্য পেষণ করিতেন। তাঁহারাই আবার কত বীরের জননী হইয়াছিলেন।'

'কাকার কাছে একটু কাগজ পড়ি মাত্র, অন্য কোন সুবিধা নাই। তুমি এত বই পড়িয়া ফেলিয়াছ শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া যাইতেছি। কি করে এত পড়ো? তোমার সংসারে কাজ নাই তাই পড়িবার এত বেশী সুযোগ পাও।'

'তোমার অনুমান মিথ্যা নহে। কাজ করিবার আবশ্যকতা থাকিলেও পড়িবার সময় করিয়া লইতে ছাড়িতাম না। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাহাকে অবসর মত সাহিত্য আলোচনা করিতে হইবেই হইবে। শরীর রক্ষার জন্য যেমন অন্নের আবশ্যক, আত্মাকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে তেমনই সাহিত্যালোচনা আবশ্যক। সাহিত্য ব্যতীত মানুষ বাহিরে মোটা হইলেও তাহার আত্মা মলিন, শীর্ণ ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে।'

ফ্লোরা কহিল,—অল্প কথায় সাহিত্য জিনিসটি কি প্রকারে বুঝান যায়?

'সাহিত্য অর্থ ঈশ্বরের অতি উচ্চাঙ্গের আরাধনা।'

ফ্লোরা বলিল,—'ঠিক কথা! সাহিত্য বলিয়া যে দেশে কোন জিনিস নাই, সেখানকার অবস্থা কি?'

এমিলি উৎসাহ ভরে কহিল, 'সে দেশের মানুষ বড়ই হতভাগ্য। এমন কোন পৈশাচিক কাজ নাই, যাহা সেখানে হইতে পারে না।

তাহারা নিষ্ঠুর, বর্ব্বর ও সঙ্কীর্ণ হৃদয় না হইয়া পারে না। তাহারা উপাসনা করিতে যাইয়া পাপ করে। তাহাদের উপাসনাই বৃথা। অন্ধ মানুষ উপাসনা ও ঈশ্বরের কি বুঝে? তাহারা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম করে। তাই যাঁহারা ঈশ্বরের নামে সাহিত্যসেবা করেন, তাঁহারা সামান্য লোক নহেন। অনেক সময় নির্ম্মম অত্যাচারে তাঁহাদিগকে জর্জ্জরিত হইতে হয়। জগতের ইতিহাসে তাহা বিরল নহে। যথার্থ কবি ও সাহিত্যিক এমন সূক্ষ্ম জিনিসের সাড়া পান, তাঁহাদের দৃষ্টি এত ভয়ানক যে তাহা সাধারণ মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারে না—তাই তাঁহারা মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু হইয়াও ব্যথিত ও লাঞ্ছিত হয়েন। যে যত বড় সাহিত্যিক সে তত

অবহেলিত হয়, কারণ সে সমসাময়িক মানুষের মন যোগইয়া কথা বলে না। অন্ধের মত মানুষের কথা অনুমোদন করিলে মানুষ আনন্দিত হয়। যে বিরুদ্ধে কথা বলে তাহাকে কে ভালবাসে? সব সময়ে অন্ধের মত মানুষের কথা মানিয়া লওয়া সত্য উপাসকের কার্য্য নহে।'

*　　*　　*　　*　　*

'মানুষের লক্ষ্য আত্মার চরম-উৎকর্ষ। সৃষ্টির আদিম কাল হইতে বিশ্ব জুড়িয়া ঋষির দল কেবল হৈ হৈ, রৈ রৈ করিয়া বেড়াইতেছেন, আর সহস্র মানুষকে নূতন নূতন পথের সন্ধান দিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছেন। নিত্য নূতন ও সরল পথ সাহিত্যিক ও কবি আবিষ্কার করেন, ইহাই সাহিত্য। সাহিত্য কোন সময় স্থির ও গতিহীন হইবে কি না বলা যায় না।'

*　　*　　*　　*

'মিস্ ফ্লোরা আরও অনেক কথা আছে, অন্য সময় বলিব। তুমি একটা কথা শুনিবে কি? যাহা শুনিলে এই ধরণের কথা বলিলে একটু শান্তি পাই—তাই এতক্ষণ ধরিয়া বলিলাম। আজ কয়েকদিন হইল মনে আদৌ শান্তি নাই। তোমার সহিত কথা বলিয়া যা একটু সুখ পাইলাম, কিন্তু উহা ক্ষণকালের জন্য।'

'কি কথা বলিতে চাহিতেছ এমিলি?'

'বলিতে সাহস হয় না!'

'তুমি কি বলিতেছ?—আমার কাছে তোমার এত লজ্জা কেন?'

'ফ্লোরা তোমার কাছে এক অতি গোপন কথা বলিতে চাই। ইচ্ছা করিলে আমার অনেক উপকার করিতে পার। সাহস পাইতেছি না।'

ফ্লোরা এমিলির হাত ধরিয়া কহিল,—বন্ধু এমন ভাবে লজ্জিত

করিবার আবশ্যকতা কি? আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইবে? আমি তোমার উপকার করিব না, এও কি সম্ভব?

এমিলির চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সহসা এমিলির এ প্রকার ভাবান্তর দেখিয়া ফ্লোরা অত্যন্ত ব্যথিতা হইল। সে এমিলির মুখের দিকে অত্যন্ত কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—'বন্ধু! তোমার যাহা বলিবার আছে, বলো, কষ্ট স্বীকার করিতে আমি পশ্চাৎপদ হইব না। আমি বুঝিতেছি, তোমার মানসিক অবস্থা ভাল নয়।'

'তোমাকে বড় কষ্টে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই আমার শেষ চেষ্টা, যদি অকৃতকার্য্য হই তবে আয়র্লণ্ড পরিত্যাগ করিব।'

ফ্লোরা এমিলির ললাট চুম্বন করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কহিল, 'বোন্ এমন কি ব্যথা তোমাকে এত চঞ্চল করিয়াছে, খুলিয়া বলো।'

এমিলির দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—সে ফ্লোরার বুকের কাছে মাথা লইয়া অত্যন্ত মৃদু স্বরে কহিল—'আমি যোশেফকে ভালবাসি, সে আমাকে গ্রাহ্য করে না।'

ফ্লোরার বুকখানি, কি জানি কেন যেন সহসা তুষারের ন্যায় শীতল হইয়া পড়িল। তাহার হৃৎপিণ্ড কে যেন সবলে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহার কণ্ঠস্বর বাঁধিয়া গেল। তথাপি সে মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল,—বন্ধু তোমার কোন ভয় নাই। তোমার জীবন যদি পুনরায় সুখময় না করিতে পারি তবে প্রতিজ্ঞা করিলাম—আমিও তোমার সহিত দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

কর্ত্তব্যের অনুরোধে, আজ ফ্লোরার সমস্ত লুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইয়া পড়িয়াছে। সে আজ তাহার দীনতা অনুভব করিতেছিল না। ফ্লোরা যোশেফের সমস্ত চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়াছে। আজ কঠিন কর্ত্তব্য তাহার মাথার উপর। পরের জন্য সে আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিবে। কণ্ঠে আজ জোর করিয়া সে কথা ফুটাইবে। তাহার সমস্ত লজ্জা আজ দূরে গিয়াছে।

তাহারি মত আর একটা জীব জ্বলিয়া মরিতেছে। প্রেমের কি ভীষণ বেদনা? ফ্লোরা নিজের কথা একটু চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিল। এমিলি কত কষ্ট পাইতেছে। ফ্লোরার যুবতী হৃদয় এমিলির জন্য কাঁদিয়া উঠিল।

রাত্রিকালে জানালার ধারে স্বচ্ছ আঁধারের দিকে তাকাইয়া সে এই সমস্ত কথা ভাবিতেছিল।

চোখের জলের সহিত সে ঈশ্বরের নিকট মুক্ত করে প্রার্থনা করিল, 'প্রভো! আমায় শক্তি দিও। আজ তোমার করুণার উপর নির্ভর করিয়া সঙ্কল্প করিতেছি—যদি এমিলির সহিত যোশেফের বিবাহ দিতে না পারি, তবে সত্য সত্যই এমিলির সহিত আয়র্লণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ধাত্রীরূপে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইব। সারাজীবন আর্ত্তের সেবায় কাটাইব। যেমন করিয়া পারি এমিলিকে সুখ দিব। তাহার অপরিসীম দুঃখের ভার লাঘব করিব। আমি সহ্য করিতে পারি না, এমিলি এত কষ্ট সহ্য

করিবে, আর আমি তাহা দেখিব, তাহারও সুখ দুঃখের জ্ঞান আমার মত। প্রভো! ভুল ভাঙ্গিয়া দাও—চক্ষু খুলিয়া দাও। তাহাকে ব্যথিত করিয়া তাহারই সম্মুখে আমি সুখ ভোগ করিব—অসম্ভব। প্রভু, তেমন পৈশাচিক আনন্দ আমি চাহি না, তেমন ঘৃণিত প্রণয়ে আমার কাজ নাই। আত্মার আত্মায় পার্থক্য কি? আমি এমিলির আনন্দে আনন্দিত হইব, আমি এমিলির সুখ আপনার ভাবিয়া লইব।'

এমন সময় খোকা আসিয়া বলিল 'দিদি! মিষ্টার যোশেফ এসেছেন।'

ফ্লোরার চাচা ও চাচী ডাবলিনে গিয়াছিলেন। সুতরাং ছেলেপিলে ছাড়া বাড়ীতে আর কেহ ছিল না।

ফ্লোরা কহিল, 'তাঁহাকে এখানেই আসিতে বল।'

ফ্লোরা এক মুহূর্ত্তের জন্য একটু জড়তা অনুভব করিল। কিন্তু ভিতরে সঙ্গে সঙ্গে একটা দারুণ শক্তি জাগিয়া উঠিল। আজ সে হৃদয়ের রাণী। রাণীর শক্তিতে সে আজ তাহার মনকে চালাইবে। বালিকার মত 'মনের' কথা সে শুনিবে না। কঠিন কর্ত্তব্য তাহার উপর, সুতরাং ছেলেমী করিলে চলিবে না।

ফ্লোরা বারান্দায় যাইয়া দাঁড়াইল। এমন সময় মিষ্টার যোশেফ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ফ্লোরা দৌড়াইয়া গিয়া যোশেফের সহিত করমর্দ্দন করিয়া অবিচলিত চিত্তে শক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—মিষ্টার যোশেফ আপনাকে দেখে বড় সুখী হচ্ছি।

যে মুখে যোশেফের সম্মুখে একটী কথা উচ্চারিত হয় নাই। সেই মুখে শক্তিপূর্ণ কথা! যে চক্ষু যোশেফের মুখের দিকে তাকাইতে সাহস পায় নাই, সেই আঁখি আজ এত স্থির।

ফ্লোরার প্রশ্নে যোশেফ হাসিয়া কহিল,—আমিও আপনাকে দেখে

বড় সুখী হচ্ছি।' যোশেফ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া চেয়ার গ্রহণ করিল।

সেখানে আর কেহ রহিল না। ফ্লোরা কহিল,—'আজকাল কাজে বড় ব্যস্ত থাকি। কাহারও সহিত মিশিতে পারি না।'

'আমার মনে হয়, আজ কাল আপনি বড় গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। কাহারও সহিত কথা বলিতে বড় ভালবাসেন না। ইহা কঠিনভাবে বলিতেছি না, সুতরাং আমার অপরাধ মার্জ্জনীয়।'

'আপনি ঠিক কথা বলিয়াছেন মিষ্টার যোশেফ।'

সে আরও কিছু বলিতে প্রলুব্ধ হইতেছিল, কিন্তু তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। সে নিজকে পর করিয়া রাখিবে—ইহা সে হঠাৎ ভুলিয়া যাইতেছিল।

সে আবার একজন বাজে ভদ্র মহিলার মত কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

ফ্লোরা কহিল,—'চিরকালই কি সমান যায়? মিষ্টার যোশেফ! সংসারে নিত্য কত নূতন পরিবর্ত্তন হইতেছে! আজ আপনাকে ডেকে বড় অভদ্রতার পরিচয় দিয়েছি। বাড়ী ছেড়ে কোথায়ও যেতে পারি না। আজকাল আমাকেই সংসারের সমস্ত কাজ করিতে হয়। বাড়ীতেও আজ আবার কেহ নাই। আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে, হয়ত বলিবার আর সুযোগ হইবে না। তাই আপনাকে আসবার জন্য একটা কার্ড লিখিয়াছিলাম। আপনি কিছু মনে করিবেন না।'

'আমি কিছু মনে করিব? বলেন কি? আমি নিজকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। আমার মনে হয়—আমার জন্য কোন শুভ-সংবাদ আছে।'

ফ্লোরার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে শক্তি সংগ্রহ করিয়া সহজ

ভাবে বলিল,—'আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা হইলে উহা আরও শুভ-সংবাদ হইবে।'

'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। অদ্যকার দিন যেন আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন হয়।'

'ভগবানের কৃপা। আমিও ইচ্ছা করি, অদ্যকার দিন আর একটি লোকের জীবনের জন্য যেন চিরস্মরণীয় হয়।'

'আমার মনে যাহা আসিতেছে, তাহ আমার ভয়াতে হয়। তাহা আমি কল্পনায়ও আনিতে পারি না।'

কথাগুলি তীক্ষ্ণ ছুরির মত ফ্লোরার হৃদয়ে আঘাত করিল। মনে মনে কহিল,—যোশেফ, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। একবারও তুমি আমায় কোনও রকমে জানিতে দাও নাই—আমি এত সৌভাগ্যবতী! কিন্তু ভগবান্ তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। তুমি এমিলির, তোমাকে বাধ্য হইয়া এমিলিকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমাকে তুমি পাইবে না। ভাবিতেও আমার প্রাণ ছিঁড়িয়া যায়। না, না, ভুলিয়া গেলাম, এমিলির সুখে আমার সুখ। যোশেফ! এমিলিকে গ্রহণ না করিলেও তুমি আমাকে পাইবে না।'

তাহার পর অতি কষ্টে সে স্পষ্ট করিয়া যোশেফকে কহিল,—আমি যাহা বলিব, তাহা বোধ হয় আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। আমি নিজেই বলিব। আপনি দয়া করিয়া আমার একটা কথা রক্ষা করিবেন কি?'

যোশেফ লজ্জিত হইয়া কহিল,—'না, এমন বিশেষ কিছু আমি মনে করি নাই। কথায় কথায় বাজে কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আমার অভদ্রতা ক্ষমা করিবেন।'

ফ্লোরা উঠিয়া যাইয়া দরজাট দিয়া আসিল। হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে

তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে অশ্রুজল চেষ্টা করিয়াও চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে দৌড়াইয়া গিয়া যোশেফের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিতে যাইতেছিল—প্রিয়! হে মধুর! প্রাণেশ, জীবিতেশ্বর আমায় দয়া করিয়াছ, আমায় আজ তবে তুমি কোলে তুলিয়া লও। আমার অন্ধকার জীবনে জোছনা ঢালিয়া দাও। আমার হৃদয়-বাগানে শত ফুল ফুটাইয়া দাও। আমি তোমার চিন্তায় কত দিন রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছি। আজ ধরা দিয়াছ। তবে দাসীকে বুকে তুলিয়া লও। তোমার মুখের একটা চুম্বন—কিন্তু সে নিজকে সংবরণ করিয়া লইল। কঠিন কর্ত্তব্যের কথা তাহার মনে পড়িল। এমিলির সুখেই তাহার সুখ, ব্যথিতের সম্মুখে সে কেমন করিয়া আনন্দ স্বীকার করিবে, ক্ষুধিতের চক্ষুর সম্মুখে সে কোন্ প্রাণে ঠোঁটে অন্ন তুলিয়া দিবে? তার চোখ হইতে অনবরত অশ্রু ঝরিতেছিল—সে সহসা যোশেফের পায়ের কাছে বসিয়া কাতর ও করুণাপূর্ণস্বরে কহিল—'মিষ্টার যোশেফ! আমার একটা কথা রাখিবেন কি? দয়া করিয়া আমার প্রতি একটু তাকাইবেন কি?'

যোশেফ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'প্রিয়তমে, এত দীনতার আবশ্যকতা কি? বহুদিন হইতে তোমাকে হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়াছি। আমি যে তোমার অনেক পুরাতন ভৃত্য।'

যোশেফ এক নিশ্বাসে এই কথাগুলি বলিয়া ফেলিল। তাহার লাল মুখ স্বেদে ভরিয়া গেল, তাহার বুক প্রণয়ের আবেগে কাঁপিতেছিল। সে দুই হাত দিয়া ফ্লোরাকে টানিয়া তুলিয়া আকুল আবেগে ফ্লোরার মুখে চুম্বন দিতে যাইতেছিল। ফ্লোরা ভীতা কুরঙ্গিণীর মত চমকিতা হইয়া অতি ক্ষিপ্র চরণে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—'মিষ্টার যোশেফ করেন কি? এ ওষ্ঠ আপনার জন্য নয়। চুম্বনের কোন অধিকার আপনার নাই।'

যোশেফ অবাক্ বজ্রাহতের ন্যায়—তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ক্ষীণস্বরে কহিল,—মিস্ ফ্লোরা! ক্ষমা করুন। আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

ফ্লোরা কহিল,—বলুন আমার কথা রাখিবেন। আপনাকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিতেছি না। আপনার কাছে কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। যদি উহা না শুনেন, তবে আমার জন্য অপরিমেয় যন্ত্রণা আছে।'

'নিশ্চয় শুনিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিব। বলুন কি কথা।'

ফ্লোরা কম্পিতকণ্ঠে বলিল—মিষ্টার যোশেফ, এমিলি আপনাকে ভালবাসে, আমি ইচ্ছা করি আপনি তাহাকে ভালবাসেন। তাহাকে বিবাহ করেন। আমার কাতর প্রার্থনা, আপনি রক্ষা করিবেন?

যোশেফ প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পলকহীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ফ্লোরা নিস্তব্ধ হইয়া তাহার এই কঠিন দৃষ্টি সহ্য করিতেছিল।

অবশেষে যোশেফ মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—মিস্ ফ্লোরা, আপনি আমাকে ভালবাসেন না?

ফ্লোরা পাথরের মূর্ত্তির মত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল—'না—ক্ষমা করিবেন।'

যোশেফ আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনি কখনও আমাকে ভালবাসেন নাই?

ফ্লোরা আবার তেমনিই শক্ত হইয়া বলিল,—কখনো না ক্ষমা করিবেন।'

যোশেফ আবার কহিলেন—অন্ততঃ একমাস আগেও না?

ফ্লোরা বলিল—'না'

ফ্লোরার সহিত করমর্দ্দন করিয়া যোশেফ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

——:০:——

বাহির হইতে বাঁশীর স্বর ভাসিয়া আসিতেছিল। আজ এমিলির বিবাহ।

ফ্লোরা একাকী তাহার নির্জ্জন কামরায় বসিয়া আছে।

বিবাহ-উৎসবে যোগ দিবার জন্য সকলেই গেল, ফ্লোরা গেল না। সে সকলকেই বলিল, তাহার বড় অসুখ। কেহ বিশেষ মনোযোগও দিল না।

বাড়ীখানি খালি করিয়া ছেলেরাও বিবাহ-উৎসবে গিয়াছে। ফ্লোরা ইচ্ছা করিয়াছিল, যোশেফের পত্নীকে সে একখানা হীরকের হার কিনিয়া দেয়। কিন্তু তাহার কিছুই নাই। সে পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুক মাত্র।

সারা দিনমান সে একই স্থানে বসিয়া কাটাইয়া দিল। সে কিছুই খাইল না। সন্ধ্যাকালে চাচী যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখনও ফ্লোরা সেই যায়গায় বসিয়া। দৃষ্টি তাহার স্থির, পলকহীন। চাচী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ফ্লোরা কেমন আছিস্?

ফ্লোরা কহিল,—এখন বেশ ভাল আছি।

তাহার পর সে ধীরে ধীরে কাপড় পরিল, এবং একাকী পার্শ্বের দরজা দিয়া রাস্তার বাহির হইয়া পড়িল। সে ডাক্তারখানায় যাইতেছে।

ডাক্তারখানা বড় বেশী দূর নহে। অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার গল্প করিতেছিলেন। ফ্লোরাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। ফ্লোরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল।

ডাক্তার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মিস্ ফ্লোরা! অদ্যকার বিবাহ কেমন দেখিলেন?'

ফ্লোরা কহিল,—'শরীর অসুখ ছিল, যেতে পারি নাই।'

'বলেন কি? এমন উৎসবে আপনি যোগ দিতে পারেন নাই!' এমিলি বড় সুন্দরী মেয়ে। তবে ঠিক আপনার মত নয়। আপনি গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।'

ডাক্তার শেষের কথা দুইটী বলিয়া একটু লজ্জিত হইলেন। একটু বিনীত স্বরে কহিলেন—ক্ষমা করিবেন মিস ফ্লোরা। অন্তরের বিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তামাসা করিবার অধিকার আমার নাই। তবে যে যাহাকে ভালবাসে তাহার চোক্ষে সেই সুন্দর। ভালবাসাতেই মানুষকে সুন্দর করিয়া তুলে।

ফ্লোরা কোন কথা বলিল না। সে চুপ করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিল।

ডাক্তার মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া ভাবিলেন,—লোকে যে ফ্লোরাকে গর্বিতা বলে, কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন নহে।

এমন সময় ডাক্তার সাহেবের ছোট ছেলেটী আসিয়া উপস্থিত হইল।

ফ্লোরা খোকাকে কোলে লইয়া সোহাগ করিতে লাগিল। ডাক্তার তখন ভাবিলেন,—ফ্লোরা গর্ব্বিতা নহে, সে বড় অমায়িক প্রকৃতির যুবতী।

খোকার হাতে কালি ছিল। সে আর স্থান পায় নাই। ফ্লোরার উঁচু ও নরম বুকের জামার উপর হাত ঘসিয়া দিল।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য হাত ধরিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই যাইবে না। সে ফ্লোরাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিল।

ফ্লোরা কহিল,—'আচ্ছা থাক। জামাটা বদলাইয়া ফেলিলেই হইবে।'

দুষ্টু খোকা ইহাতে নিরস্ত হইল না। সে ফ্লোরার বুক খুলিয়া দুধ খাইবে। অনবরত সে দুধের আশায় মুখ ঘসিতে লাগিল।

এমন সময় ডাক্তার-বধূ আসিয়া খোকাকে কোলে লইলেন।

অতঃপর কিছুক্ষণ আলাপের পর ফ্লোরা কহিল, ডাক্তার সাহেব আমি এক ফাইল কার্ব্বলিক এসিড চাই। আপনাদের সঙ্গ যে বড় মধুর! এখানে আসিলে আর যাইতে ইচ্ছা হয় না।

অতঃপর এসিডের ফাইল লইয়া, খোকাকে আবার একটু সোহাগ করিয়া ফ্লোরা বাহিরে বাহির হইয়া পড়িল।

ডাক্তার-বধূ ডাক্তারকে কহিলেন,—মিস্ ফ্লোরা বড় ভাল মেয়ে, দেখিতে যেমন গুণেও তেমন। ডাক্তার কহিলেন,—তোমার অনুমান মিথ্যা নহে।

'ওর কি কোন ভাল বর জুটে নাই।'

'ওর চাচা ভাল লোক নহে। ভদ্রতার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। মেয়ে

ভাল হইলে কি হয়। পিতা মাতা ও ভাইয়েদের স্বভাবের উপর মেয়ের বিবাহ অনেকটা নির্ভর করে।

*   *   *   *   *

প্রাতঃকাল অনেকক্ষণ অতীত হইয়াছে, তবুও ফ্লোরা দরজা খুলে না।

তাহার চাচী দরজার কাছে যাইয়া বড় বড় করিয়া বলিতে লাগিলেন,— লক্ষ্মীছাড়া, ঘযসা মেয়ে, এত বেলা হয়ে গেল তবুও চৈতন্য নাই, যেন তুর্কী দেশীয় আমীর-পত্নী।' তারপর অভিমানমাখা স্বরে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, 'তা আমাদের কি? তোমার ভাইয়ের মেয়ে, আমরা বেশী কথা কইতে কেন যাব।'

বৃদ্ধ মিষ্টার এডমণ্ডের বড় ভাল লাগিল না। স্ত্রীর কথাগুলি ইদানীং বড় তীব্র রকমের হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ফ্লোরা তাহার ভাইয়ের মেয়ে। ইহা কি মিথ্যা কথা? তার আপন ভাইয়ের মেয়ে। যে ভাই আর সে একই মায়ের দুধ পান করিয়াছিল, ফ্লোরা সেই ভাইয়ের মেয়ে। সহসা তাঁহার মনে পড়িল তাঁহার বড় ভাবী মরিবার সময় এক হস্ত ঊর্দ্ধে উঠাইয়া অন্য হস্তে ফ্লোরার হাত ধরিয়া তাঁহার কাছে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। এই অবহেলা, এই নির্ম্মম অত্যাচার কি তার প্রতিদান? বৃদ্ধ মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না।

বৃদ্ধ এতদিন বুঝিতে পারেন নাই, আজ যেন সহসা মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের সম্মুখে এক দীর্ঘ অত্যাচার ও অবহেলার চিত্র ফুটিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে ফ্লোরার দরজার সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অতি ধীরে ধীরে ডাকিতে লাগিলেন, 'মা! মা! ফ্লোরা ওঠো। অনেক বেলা হইয়াছে। .

ফ্লোরা সাড়া দিতেছিল না কেন? তাহার পিতা মাতার মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে একবারও মা বলিয়া ডাকে নাই। ওঃ. মা নাম কি মধুর নাম। ফোরা দরজা খোল। ফ্লোরা দরজা খোল। আজ অনেক দিন পরে তোমার কাকা তোমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেছেন। দরজা খোল। কাকার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমার কাকা তোমাকে চিরকালই মা বলিয়া ডাকিতে লজ্জিত হইয়াছেন। তুমি বড় নও, তোমার বাবা রাজা নন, তোমাকে মা বলিয়া ডাকা লজ্জার বিষয় নয় কি? তুমি কি এই সত্য কথা বুঝ না? তাহলে অভিমান দূর কর। ফ্লোরা দরজা খোল! তুমি জান না, এই বিচিত্র সংসারে চাচা ত দূরের কথা পিতাও সম্পদের দাস। স্বার্থের ভিক্ষুক। সব মিথ্যা— ভালবাসা, প্রেম, ধর্ম্ম, মিথ্যা সব। তা হলে অভিমান দূর করো।

*　　　*　　　*　　　*

বেলা একটা হইয়া গিয়াছে। তত্রাচ ফ্লোরার ঘর বন্ধ।

মিষ্টার এডমণ্ড আর ঠিক থাকিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি কুঠার লইয়া দরজার উপর প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন। দরজা ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া গেল।

বৃদ্ধ চাহিয়া দেখিলেন—'এ কি দৃশ্য? ফ্লোরা, প্রাণের ফ্লোরা, এ কি ভয়ানক দৃশ্য?' এই কথাগুলি বলিয়াই মিষ্টার এডমণ্ড মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

মেজের উপর কার্ব্বলিক এসিডের শিশিটী পড়িয়া রহিয়াছে। জ্বলন্ত আগুনের মত কার্ব্বলিক এসিড বিষ! ফ্লোরার মুখে। ওঃ! কি ভয়ানক, কি সাংঘাতিক! মুখখানি একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে।

একখানা হাত খাটের এক দিকে ঝুলিয়া আছে। এই সাংঘাতিক

বিষ পান করিয়া সে একটুও নড়ে নাই ? বেদনার ও চাঞ্চল্যের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। একখানা চাদরে তাহার বুক পর্য্যন্ত ঢাকা। চোখ দুটী মুদ্রিত। মাথার এক পার্শ্বের চুল খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। বাম হাত দিয়া শিশিটী ফেলিয়া দিবার সময় মাথায় বোধ হয় খানিক ছিটিয়া পড়িয়াছিল।

চৈতন্য সম্পাদিত হইলে মিষ্টার এডমণ্ড উন্মত্তের ন্যায় ঘর হইতে বাহির হইলেন। দৃষ্টি তখন তাঁহার অত্যন্ত ভীষণ!

বৈঠকখানায় বন্দুক ছিল। তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে সেটাকে বুকের উপর রাখিয়া ফ্লোরার বিছানার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাহার পর ফ্লোরার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'ফ্লোরা, চাচার উপর রাগ করিয়া কোথায় যাইবে ? ফ্লোরা, আমি তোমাকে ছাড়িব না। আমি দাদার সম্মুখে মরণের পর কেমন করিয়া মুখ দেখাইব। ভাবী যখন জিজ্ঞাসা করিবেন,—এডমণ্ড! আমার ফ্লোরার কোন কষ্ট হয় নাই ত ? তখন আমি কি কহিব ? নিজ হস্তে আমি আমার শাস্তি গ্রহণ করিতেছি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক'—এই কথাগুলি বলিয়া তিনি বন্দুকের অগ্নিপথ গলার কাছে ঠাসিয়া ধরিলেন।

মিসেস্ এডমণ্ড দৌড়াইয়া গিয়া বন্দুক কাড়িয়া লইলেন।

ফ্লোরার কাকা মাটীতে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার মূর্চ্ছিত হইলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

——•*•——

উইলিয়ম কোথায় চলিয়া গিয়াছে তার ঠিক নাই। অসহ্য যন্ত্রণায় লেডী সেমেরার জীবন ভরিয়া উঠিয়াছিল। ফ্লোরার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সেমেরার জীবন আরও ভার বোধ হইতে লাগিল। জীবনের সকল স্নেহ, সম্বন্ধ একে একে ছিন্ন হইয়া গেল। জীবন যত শীঘ্র চলিয়া যায় ততই তাঁহার পক্ষে ভাল।

তিনি একদিন আয়ার্লণ্ডে যাত্রা করিলেন। মিঃ মর্ণোর সহিত ইহার পর আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

পুস্তক প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সুতরাং সকল কথা বিশদরূপে বলিতে পারিতেছি না।

নীলরতন ব্যারীষ্টার হইয়াছেন। মিঃ মর্ণোর অনুরোধে বা যে কারণেই হউক, বুকে দারুণ ঘৃণা লইয়া সরলা নীলরতনকে বিবাহ করিয়াছেন।

*　　　*　　　*　　　*

নীলরতন নব বধূ লেডী সিরেলকে লইয়া 'হেলেন' নামক জাহাজে উঠিলেন। হেলেন সমুদ্রের বুকে ভাসিতে ভাসিতে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিল। ব্যারীষ্টার নিজের জন্য এক কামরা এবং স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে পার্শ্বেই এক কামরা ভাড়া লইলেন। ১৮৮৭ সালের ১২ জুন মধ্যাহ্ন কালে তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছেন। স্ত্রীর সুবিধার জন্য নীলরতন নিজ হস্তে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন। লেডী সিরেল

কোন কথা কহিতেছিলেন না। নীলরতন তাঁহাকে বিরক্ত না করিয়া নিজের প্রকোষ্ঠে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

খোলা জানালা। নীলসমুদ্রের ভৈরব মূর্ত্তি সরলার চোখের সম্মুখে এক করুণ উদাস চিত্র আঁকিয়া দিতেছিল। সীমাহীন উন্মত্ত তরঙ্গ, প্রাণের ভিতর অনন্তের রাগিণী গাহিয়া যাইতেছিল।

লেডী সিরেল এত মৌন কেন? ব্যারীষ্টার কি অন্যায় করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন? নিতান্ত অনিচ্ছা থাকিলে কি সিরেল তাঁহাকে বিবাহ করিতেন? নীলরতন ইংলণ্ডে সহস্র সহস্র রমণী দেখিয়াছিলেন কিন্তু লেডী সিরেলের মত সুন্দরী একজনও তিনি দেখিতে পান নাই। কি সুন্দর তাঁর গায়ের বর্ণ! ঈষৎ লোহিত গোলাপ পাপড়ীর মোহন রঙে সিরেল সৌন্দর্য্যময়ী। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে যেমন, ঠিক তেমনি সে। নীলরতনের বিবাহ একটা ফ্যাসান বৈত নয়? ভাগ্যক্রমে এই অসামান্যা রূপসী তাঁহার লাভ হইয়াছে। তিনি ফ্যাসানের খাতিরে অতি জঘন্য বিলেতি রমণীকে বিবাহ করিয়াও ভারতবর্ষের মূর্খ সমাজকে ভীত, ত্রস্ত করিতে ছাড়িতেন না! নীলরতন দেখিলেন—লেডী সিরেল বড গর্ব্বিতা রমণী। কিন্তু এ গর্ব্বে নীলরতন দুঃখিত হইলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীর গর্ব্বে গৌরব অনুভব করিতেছিলেন। গর্ব্বিতা হইলেও সে তাঁর স্ত্রী! এই তাঁর ধারণা।

সন্ধ্যাকালে ইচ্ছা হইল তিনি তাঁহার স্ত্রীর কাছে যান। সে ধীরে ধীরে যাইয়া দরজা খুলিলেন। নীলরতন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন লেডী সিরেল দিব্যি বাঙ্গালী মেয়ের মত সেমিজের উপর একখানা শাড়ী পরিয়া শুইয়া আছে। গোলাপী রঙ্গের সেমিজ, আর তার উপর অতি মিহি সূতার একখানা সাড়ী। গাউন, হ্যাট সব পার্শ্বে র্যাকেটে ঝুলিতেছিল।

ভালবাসায় অধীর হইয়া নীলরতন ভাবিলেন, লেডী সিরেল, মিঃ মর্ণোর সহিত যখন ভারতবর্ষে ছিলেন, তখনই তিনি ভারতীয় আচার-পদ্ধতির সহিত পরিচিতা হইয়াছিলেন। বিলেতী সমাজের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি ভারতবর্ষে এক সম্পূর্ণ নূতন সমাজে পড়িবেন, তাহা ছাড়া তাঁহার বিবাহ হইল এক বাঙ্গালী ব্যারীষ্টারের সহিত; সুতরাং বুদ্ধিমতীর মত তিনি তাঁহার রুচি ও আচার ব্যবহার পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া লইতেছেন। নীলরতন চাহিয়া দেখিলেন বাঙ্গালী বেশে লেডী সিরেল পরীর মত মোহিনী।

নীলরতন উদ্বেল হৃদয়ে সরলাকে চুম্বন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

সরলা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—অঙ্গস্পর্শ করিও না। এ অঙ্গের উপর তোমার কোন অধিকার নাই। সরলার স্বর অত্যন্ত কঠিন।

নীলরতনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি স্তম্ভিত বালকের মত তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিলেন—মিঃ মর্ণোর ভগ্নীর মুখে, পরিষ্কার বাঙ্গালা কথা। আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?

সরলা কহিলেন—কি নীলরতন? বালকের মত চুপ করিয়া রহিলে যে? আমাকে বিবাহ করিয়াছ? বিবাহে সন্তুষ্ট থাক। নিকটে আসিও না। মিঃ মর্ণোর শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়াছ ভাবিয়াই আনন্দ লাভ কর!

সরলা আবার কহিলেন—অনেকদিন আগেকার কথা আমার দিকে একটু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, এই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম

সরলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার কহিতে লাগিলেন—ভাল করিয়া দেখ,

আমার মুখ পানে তাকাইয়া দেখ। চিনিতে পারিতেছ কি? এই বাঙ্গালী মহিলার বেশে আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? ভারতবর্ষে তখন তুমি কলেজের ছেলে ছিলে। বেশ করিয়া তাকাও। চিনিতে পারিতেছ না? আচ্ছা বেশ।

সরলা ঝড়ের বেগে বাক্সখুলিয়া ফেলিলেন। অতি জীর্ণ, অতি পুরাতন একখানা মলিন শাড়ী তিনি বাহির করিলেন। ২।৩ জায়গায় ছেঁড়া সেই শাড়ী তিনি অবিলম্বে পরিয়া নীলরতনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—দেখ নীলরতন এখনও আমায় চিনিতে পারিতেছ না? এই জীর্ণ কাপড়ে এই সুন্দর দেহখানি ঢাকিয়া এক সময়ে সাহায্যের জন্য তোমাদের বোর্ডিং ঘরের দরজায় গিয়াছিলাম। মনে পড়ে? আমার তখন পেট উঁচু ছিল। বারবিলাসিনী মনে করিয়া কি বলিয়াছিলে, মনে আছে? সে কথাগুলি এখনও আমার কর্ণে বাজিতেছে? মনে পড়ে কি সেই কথাগুলি? কামরা হইতে লাফাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিয়াছিলে—'ওরে! বোর্ডিংঘরে অতঃপর শ্রীমতী কুসুমকুমারীর প্রবেশ!' মনে পড়ে? তারপর গলায় ধাক্কা দিয়া পথে বাহির করিয়া দিয়াছিলে।

তাহার পর সরলা তাড়াতাড়ি সেই জীর্ণ বসন আবার বাক্সে বন্ধ করিয়া কহিলেন—এই বসন যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন সঙ্গে সঙ্গে রাখিব। তাহারপর যেদিন আমার জন্য শেষ শয্যা প্রস্তুত হইবে, সেই দিন এই শাড়ী আমার দেহের সঙ্গে সঙ্গে মাটী হইবে।

নীলরতন কহিলেন,—আমায় ক্ষমা কর।

সরলা অধিকতর উত্তেজিতা হইয়া কহিলেন,—কি আশ্চর্য্য! বারবিলাসিনীর কাছে ক্ষমা চাহিতে লজ্জা হইতেছে না! এই তোমার শিক্ষা, এই তোমার হৃদয়ের জোর, বারবিলাসিনীর প্রণয় চাও?

"তুমি বারবিলাসিনী নও। আমার অত্যন্ত ভুল হইয়াছিল। আমায় ক্ষমা কর।"

"এখনও আমার লোভ সংবরণ করিতে পারিলে না? কেন, তখন আমি বাঙ্গালী ছিলাম, এখন জাল বিলাতী মহিলা সাজিয়াছি এ জন্য? জীর্ণ কাপড়ের পরিবর্ত্তে গাউন পরিতে শিখিয়াছি এই জন্য? বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে ইংরাজী বলি এই জন্য? জাল নামে পরিচিতা এই জন্য? তোমার কাছে কি শুধু কাপড়ের আদর, শুধু মিথ্যার আদর, শুধু বাহিরের আদর? এই তোমার শিক্ষা? যে এত ছোট তাহাকে আমি ভালবাসিতে পারিব না।" বিবাহ? তোমাকে খাঁটী বাঙ্গালীরূপে ফিরাইয়া আনিতে করিয়াছি; তাহা ভুলে যাও।

নীলরতন তথাপি কহিলেন—আমি তোমাকে ভুলিতে পারিতেছি না। আমাকে ক্ষমা কর।

"তবে কি তুমি আমায় অসতী হইতে বল? বিবাহিতা রমণীকে আবার বিবাহ করিতে বল। যদি অসতী হইতাম, তবে তোমার ন্যায় সহস্র অপদার্থ এতদিন কলিকাতার রাস্তার ধারে আমার চরণ চুম্বনে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিত। যে দিন অসতী হইবার সম্ভাবনা হইবে, সে দিন এই দেখ এই অস্ত্র নিজের বুকে বসাইয়া দিব। প্রথমে শত্রুর বুকে বসাইতে চেষ্টা করিব, না পারিলে আত্মহত্যা করিব। চন্দ্র, সূর্য্য কক্ষচ্যুত হইবে কিন্তু বিলাসের পত্নী অসতী হইবে না। আমার স্বামী বিলাস। সে অনেক কথা। যাও, বাহির হইয়া যাও। পরস্ত্রীর কাছে অধিকক্ষণ থাকিও না—বিশেষতঃ আমি যখন বাঙ্গালী! যদি বিলম্ব কর এখনই পুলিশ ডাকিব। কে তুমি? আমি তোমাকে চিনি না। মর্ণোর শ্যালিকা তুমি বিবাহ করিয়াছ, একথা কে বলিল? মিঃ মর্ণোর একমাত্র

শ্যালিকা ফ্লোরা। সে কিছুদিন হইল আয়র্লণ্ডে বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যাও, দূর হও! আর এখানে আসিও না। পরস্ত্রীর সহিত প্রণয় করিতে গেলে কি শাস্তি হয়, তাহা তুমি বেশ অবগত আছ।"

নীলরতন নির্ব্বাক্ হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—·—:*:——

কয়েক বৎসর পরে গোরোকপুর মিশন হাউসের সম্মুখে একদিন সহসা সুরেন বাবু সরলাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—আমার বড় সৌভাগ্য, দিদি। আমি প্রতিদিন আপনার অভাব অনুভব করিতেছিলাম। আপনি যে এত পরের হইয়া যাইবেন, তাহা কখনও ভাবি নাই।

সরলা বলিলেন,—ভগবান্ যে আমায় দেশে ফিরাইয়া আনিলেন এজন্য তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি।

"দিদি দাদার কাছে আসিবেন, ইহাতে আবার বিস্ময়ের কি আছে? বিদেশভ্রমণে গিয়াছিলেন এতদিন পরে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। দিদি, একাকী সকল কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। আমার সমস্ত চিন্তা দূর হইল।"

তখন বেলা আট টা। সুরেন বাবু মুড়ি ও পাটালী বাহির করিয়া সরলার সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন,—দিদি ইংলণ্ডে থাকিয়া বাঙ্গালীর ঘরের চিড়ে গুড়ের কথা মনে আছে ত,?

সরলা কহিলেন—দাদা, আমাকে লজ্জিত করিতেছেন। বিদেশের কেক্ অপেক্ষা বাঙ্গালার চিড়ে গুড় আমার কাছে অধিক মধুর। দাদা! বঙ্গালীর ঘরে গাছি ভায়ের পাটালী, চাষা ভাইয়ের মোটা ধান, আর জোলা ভাইয়ের মোটা কাপড় ছাড়া ভাল আর কি আছে? দাদার ঘরে যা আছে, তাতেই আমার গৌরব। দাদা কি হতভাগা আব্দারে ভগ্নীর জন্য চুরি করিতে যাইবেন?

পাদরী সুরেন বাবুর জীবন আরও পূর্ব্বাপেক্ষা সাদাসিদে হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চটী জুতার দাম বার-আনার বেশী নহে। ছুটীমাত্র সাদা পাঞ্জাবী, ছুখানা চাদর।

ঘরের আসবাবের মধ্যে, তিন ঘরে তিন খানা খাট। প্রত্যেক খাটে এক একটা কম্বল, আর সাদা একখানা বিছানার চাদর, চাদরগুলি সাতদিন পরে নিজেই পরিষ্কার করেন। ঘরে একখানা চেয়ারও নাই। বাহিরে একখানা খাট পড়িয়া আছে। তিনি সেখানেই বসেন। পিয়ন, ছুধওয়ালা, চাপরাসী সকলেই তাঁহার বিছানার পার্শ্বে বসে। ঘরগুলি যারপর নাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মাংস প্রায় খান না। চায়ের পরিবর্ত্তে মুড়ী খান; আহারে ছুগ্ধ ও ঘি হইলেই যথেষ্ট।

পিতৃমাতৃহীন কতকগুলি বালকবালিকা লইয়া তাঁহার জীবন আনন্দে অতিবাহিত হইতেছিল। খোদার হাতে নিজকে সমর্পণ করিয়া তিনি বাঁচিয়া আছেন। দায় বিষাদের কোন ছায়া তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

এমন সময় সহসা একদিন সরলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—–•:•:০—–

সরলা সরকারী মেয়ে, প্রচারক হইয়াছেন। আশরফ খানসামাকে লইয়া মেমসাহেব বাজার হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। সহসা পার্শ্ব হইতে একটা আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

সরলা দেখিলেন একটা অনুমান বিংশতিবর্ষীয় যুবক উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তার পার্শ্বে পড়িয়া আছে। কাছেই কতকগুলি মূত্রবিষ্ঠাপূর্ণ কাপড়। তাহার শরীরের অস্থি বাহির হইয়া গিয়াছিল।

সরলা আশরফকে সেই স্থানে দাঁড়াইতে বলিয়া অতি দ্রুতপদে কুঠীর দিকে চলিয়া গেলেন এবং অবিলম্বে দুইজন মেথর ও একখানা খাট লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

দারুণ দুর্গন্ধে আশরফের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইতেছিল। সে মনে মনে সরলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, মাগি মানুষকে খৃষ্টান করিবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করে। কোথায় কোন্ মরা পড়িয়া আছে, কে কোথায় কাঁদিতেছে, কাহার ঘরে অন্ন নাই, এই সব করিয়া মানুষকে পাকে ফেলিবার চেষ্টা।

মেমসাহেব একখানা কাপড় দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিজ হস্তে মুছিয়া দিলেন এবং আর একখানা কাপড় দিয়া তাহার অঙ্গ ঢাকিয়া দিলেন। যখন মেথরদের সহিত ধরাধরি করিয়া সরলা সেই পীড়িত যুবককে খাটের উপর তুলিয়া দিলেন, তখন আশরফ দৌড়াইয়া আসিয়া কহিল—

হুজুর গোলামকে হুকুম করিলেই হইত। গোলাম দাঁড়াইয়া থাকিতে এতনা তাখলিফ্ কেঁউ উঠাতে হেঁ।

মেমসাহেব কহিলেন—তোমার অভ্যাস নাই, তুমি দূরে থাক। অভ্যাস না থাকিলে এসব কার্য্য পারিবে না। তোমার উপর আমি বিরক্ত হইব না। আশরফ্ হাসিয়া কহিল,—যে আজ্ঞা, হুজুরের মেহেরবাণী।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগীকে লইয়া সরলা কুঠীতে ফিরিয়া আসিলেন। এক নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উহাকে রাখিয়া সরলা ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রোগী অত্যন্ত ঘামিতেছিল। সরলা পার্শ্বে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

এমন সময় সুরেন বাবু আসিয়া কহিলেন—দিদি, আপনি আমাকে মোটেই খবর না দিয়া একাকা এত কষ্ট করিতেছেন কেন?

সরলা কহিলেন,—আপনি গত রাত্রে মোটেই ঘুমান নাই। তাই আপনাকে ডাকি নাই।

তাঁহারা কথা বলিতেছেন এমন সময় ডাক্তার আসিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—রোগীর অবস্থা বড় খারাপ। দীর্ঘ দিন ইন্দ্রিয়-সেবা করিয়া সে দারুণ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। শরীরে কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই;—সামান্য আহার পরিপাক করিবার ক্ষমতাও সে হারাইয়াছে। তাহার জীবনী শক্তি শনৈঃ শনৈঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। আমি ঔষধ দিয়া যাইতেছি, কি ফল হয় সন্ধ্যাকালে জানাইবেন।

সরলা ও সুরেন বাবুর যত্নে এবং ঔষধের শক্তিতে রোগীর অবস্থা

ক্রমশঃ ভাল হইতে লাগিল। খোদার ইচ্ছা না হইলে মানুষ মরে না—ইহা সত্য কথা, মিথ্যা নহে। সন্ধ্যাকালে রোগী কথা বলিয়া উঠিল। দুপুরে সে একবার চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এ প্রকার আশাতীত উন্নতি দেখিয়া সরলা অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন। সরলা অতি ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কেমন বোধ হইতেছে ভাই?

রোগী কহিল,—এখন আমার কোন অসুখ নাই।

সে আবার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আমি কোথায়? আপনি কে মা? আমি নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি। আমি এখানে কি প্রকারে আসিলাম? আপনারাই বা এ সামান্য ব্যক্তির কাছে এমন করিয়া কেন বসিয়া আছেন?

সরলা কহিলেন—তোমার কোন ভয় নাই ভাই! তোমার শরীরের অবস্থা বড় খারাপ। তুমি এখন কথা বলিও না। সব কথা পরে জানিতে পারিবে। মনে কর তুমি বাড়ীতে আছ।

রোগীর দুই চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

* * * *

"গত জীবনে যত সুখ করিয়াছি তাহার একটু কি মনে আছে? তবে এ মোহ কেন? হায়! হায়—চৈতন্য হইল না। খোদা! আমাকে জ্ঞান দাও। সর্ব্বস্ব যাহাদিগকে দিয়া দিয়াছি, কই তাহারা এ বিপদের সময় কোথায়? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, উচ্ছৃঙ্খল আমোদে কাটাইয়া দিয়াছি। কই কামনার ত নিবৃত্তি হইল না?

এত সুখভোগ করিলাম, মনে নাই সুখের আস্বাদ কেমন! তবুও এ ভুল কেন? কি শোচনীয় পরিণাম। মাতা, স্ত্রী, পুত্র থাকিতেও রাস্তার

ধারে পড়িয়াছিলাম, কোথা হইতে এক দেবী আসিয়া জননীর মত আমাকে কুড়াইয়া লইলেন।

প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আর পাপ করিব না। যে সুখের অস্তিত্ব থাকে না তাহার ভোগের জন্য এত আকাঙ্ক্ষা কেন? কি পিশাচ আমি! কি অপদার্থ ঘৃণিত নরকের কীট আমি! স্ত্রীর জীবন অন্ধকার করিয়া উন্মত্তের ন্যায় কোথায় ছুটিয়া ছিলাম! পৈশাচিক শক্তি শত কুহকিনীর বেশে আয় আয় বলিয়া আমায় ডাকিত। হায় হায়! এস্‌লামের বুকে অসি হানিয়া কোথায় যাইতেছিলাম?

বিলাসিনীর বিলাসনৃত্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমাকে মাতাইবার জন্যই ত তাহারা দাঁড়াইয়া আছে। পরাজিত হইয়াই আমি হাসিয়াছি! কি আশ্চর্য্য! পরাজিত হইয়া কে কবে হাসিতে পারে?

খোদা, তুমি মানুষকে এত কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছ! বোধ হয় মানুষের এই স্থানেই মহত্ত্ব। এক দিকে পাপ অন্য দিকে পুণ্য। পাপ, পুণ্য অপেক্ষা কম ভয়ানক নহে। হে মহান্ খোদা! তুমি এত দয়ালু, সয়তানকেও তুমি অসীম ক্ষমতা দিয়াছ। কি উদার তুমি! বুঝিলাম মানুষের জীবন খেলার বস্তু নহে। সে জীবনব্যাপী সংগ্রামে জয়ী হইবে, তবেই তাহার জয়, তবেই তাহার অস্তিত্ব।

কে এই মেম সাহেব? করুণাময়ী মা, তুমি আমাকে জীবন দাও নাই, তুমি আমায় জ্ঞান দিয়াছ। আমার সমস্ত ভুল আমার কাছে আজ ধরা পড়িয়াছে। আর না! আর না! আজ আমার জ্ঞান লাভ হইয়াছে।

এমন সময় সরলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হোসেন কি চিন্তা

করিতেছে ? তুই এক দিন দেরী করিয়া বাড়ী গেলে হইত না ? শরীর ঠিক সুস্থ হইয়াছে তো ?

হোসেন কহিল,—আজ্ঞে না, আজই বাড়ী যাইব। খোদার আশীর্ব্বাদে ও আপনাদের কৃপায় শরীরে বেশ সামর্থ্য হইয়াছে। এখন আমার কোন অসুখ নাই।

হোসেন সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু বলিব না। কারণ সময় নাই, স্থানও নাই। শুধু এই টুকু বলিলেই হইবে, তাহার জীবনের সমস্ত কলঙ্ক ইহার পর কিসের স্পর্শে যেন নষ্ট হইয়া গেল।

সরলা-প্রদত্ত ৫০৲ টাকা লইয়া হোসেন ব্যবসা আরম্ভ করেন। কালে তিনি একজন বিখ্যাত বণিক্ হইয়াছিলেন। তিনি সরলার উপদেশ অনুসারে ঘরে বসিয়া নানাবিধ বিদ্যা আলোচনা করিয়া শেষ জীবনে এক বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে সরলা তাঁহার কাছে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। সেখানা আমরা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

মিশনারি হাউস।

গোরক পুর

২৫শে আগষ্ট, ১৮৮৯।

প্রিয় হোসেন,

তোমার পত্র পাইয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইলাম। তুমি লিখিয়াছ তোমার বন্ধুগণ যখন বাড়ী আসেন তখন তোমার হৃদয়ে দারুণ লজ্জা উপস্থিত হয়। মুদীর দোকান দিয়াছ সেই জন্য! তুমি যদি তোমার আত্মার দীনতার জন্য লজ্জিত হইয়াছ লিখিতে, তাহা হইলে তোমার উপর আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতাম। মুদীর দোকান দিয়া তোমার শিক্ষিত বন্ধুদের সম্মুখে লবণের পোটলা বাঁধিতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ কর

ইহা পড়িয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। তুমি লেখা পড়া জান না এই জন্য বন্ধুদিগের সম্মুখে দাঁড়াইতে তোমার লজ্জা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আজ যদি তুমি তোমার বর্ত্তমান বিদ্যা লইয়া ১০।১৫ টাকায় আফিসের কেরাণী হইয়া উপরওয়ালার কাণমলা খাইতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার এ দুঃখ হইত না। বিস্ময়ের কথা! তুমি জান না, জগতের অতীত দুই শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি রোম ও আরবের আদি মহাপুরুষদের জীবন কত সরল ও সুন্দর ছিল।

তুমি লিখিয়াছ, 'উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী হইতে বকাটে ছেলে নাম ধারণ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলাম, জীবন আমার অন্ধকার-ময়। জীবনে নাই বিদ্যা, নাই সম্মান।'

তুমি ঘরে বসিয়া বিদ্যালোচনা করো, কারণ জ্ঞান ও সহিত্য সম্বন্ধ-হীন মানুষ ঘৃণিত না হইয়া পারে না। তুমি তোমার মাতৃভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পার। যদি আত্মার দৃষ্টি খুলিয়া যায় তাহা হইলে বিশ্ব ও মনুষ্য সমাজ অধ্যয়ন করিয়া দিন দিন অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

ইংরাজী সাহিত্য খুব বড় সাহিত্য, সুতরাং ইংরাজী যদি কিছু কিছু পড়িতে পার ভাল হয়। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর তাহা হইলে এখনও তুমি বড় হইতে পার। ইচ্ছা থাকিলেই পথ আছে। তুমি কেন, প্রত্যেক নরনারী ইচ্ছা করিলে জীবনের যে কোন সময় বি-এ, এম-এ পাশ করিতে পারে। তুমিও পার। চাই পরিশ্রম ও বিশ্বাস। মানুষ হাসিয়া খেলিয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া দেয়।

মোসলমান সমাজের ভিতর এমন সমস্ত কথা আছে যাহা তাহাদিগকে ১০ বৎসরের ভিতর এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে পারে।

এসলাম আজ এত নীচে কেন? সে কি কথার অভাবে? কোরাণের ন্যায় মহাগ্রন্থ যাহাদের সম্পত্তি তাহারা কখনও ছোট হইতে পারে না। অভাব কেবল মানুষের, জীবন্ত শক্তি ও ভাবের।

বর্ত্তমানতার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। নচেৎ জ্ঞান খাটি হইবে না।

পরিশ্রম করো। প্রত্যেক মানুষই বড় হইতে পারে, কেবল আলস্য ও অবহেলা মানুষকে হত্যা করে। সংসারের আঘাতে ব্যস্ত হইবে না।

আশীর্ব্বাদ করি, সাধকের মহা মহিমায় তোমার দোকানঘরের প্রত্যেক বালুকণা মহিমান্বিত হউক।

তোমার ময়দার দাম বাবদ ২০৲ টাকা পাঠাইলাম।

তোমার বুবু—সরলা।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—:0:—

রাত্রি বারটার সময় একাকী আরাম-কেদারায় পা উঠাইয়া সরলা গাহিতেছিল—

সারাটী জীবন
কাটিয়া চলিছে
মরণ-আঁধার
ঘনায়ে আসিছে
আর বুদ্ধি নাহি আসে।

গান শেষ করিয়া সরলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। /অতি যত্নে লাল কাপড়ে বাঁধা একখানি ফটো বাক্স হইতে বাহির করিয়া আবার তিনি বাহিরে আসিলেন। কেদারাখানি ফিরাইয়া অতি সন্তর্পণে তিনি ছবিখানি খুলিতেছিলেন। উজ্জল চন্দ্রালোকে আহমদের সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি সরলার বুকের কাছে ভাসিয়া উঠিল।

ছবিখানি একটুও খারাপ হয় নাই। সরলা ভাবিতে ছিলেন, ভাই তুমি আজ কোথায়? এই চক্ষু, এই মুখখানি সবই ধূলার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

সরলার গলা ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতেছিল একবার গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া লন। বর্ত্তমানতার সমস্ত ভাব তিনি বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার মনে হইল তিনি যেন আবার সেই নির্ভরশীলা বোন্ রূপে আহমদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। পনের বৎসর আগেকার সরলার সহিত, অদ্যকার এই প্রৌঢ়া সরলার সহিত কোন পার্থক্য নাই।

মেমসাহেব বালিকার মত অতীত কথা চিন্তা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই স্বপ্নের কথা তাঁহার মনে হইল, আহমদ বলিয়াছিলেন—'সরলা, জড় দেহের উপর এত মায়া কেন। উহা ফেলিয়া দাও। শৃগাল কুক্কুরে খাইয়া থাকে।' তার পর আহমদের সেই উজ্জল জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। পুলকে সরলার হৃদয় মন ভরিয়া গেল। কি সুন্দর কি মহিমাময় যে জ্যোতিষ্মান্ মূর্ত্তি।

সরলা ছবিখানি মাথার কাছে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—হে ঋষি, হে আমার দাদা! তুমি স্বর্গের মানুষ স্বর্গে গিয়াছ। তোমার সঙ্গে

আমার দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে, আমার সকল অন্ধতা দূর হইয়াছে। আজ তোমারই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মানুষের জন্য কাঁদিতে শিখিয়াছি। ধর্ম্ম প্রাণের জিনিষ, বাহিরের খোলষের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। অবস্থাচক্রে খৃষ্টানের বেশে আছি। শুধু অন্ধ বিশ্বাস ও নামে আমাদিগকে মুক্তি দিবে না! মুক্তি আত্মার গৌরবে, জ্ঞানে ও এলাহীর অনুভূতিতে। ইহাতেই এস্লামের সার্থকতা। হায়! এই মহাধর্ম্ম এত নিকটে থাকিয়াও কোন হিন্দু চিনিল না। সমস্ত বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য এস্লাম জগতে আসিয়াছিল। প্রভো, এ জীবনে কি আর প্রকাশ্যে এস্লামের সেবা করিতে পারিব না? মহামানুষ অজানিত আহমদের নাম বড় করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিব না?

বুকের উপর ছবিখানি রাখিয়া সরলা ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আষাঢ় মাসের বৃষ্টিতে রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছিল। গাড়ী ছাড়া এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না। চলিতে গেলে জানু পর্য্যন্ত দাবিয়া যায়। লোকের চলাফেরার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। একদিন বৃষ্টি না হইয়া যায় না।

কিন্তু সে জন্য দুনিয়ার কাজ বন্ধ ছিল না। সরলা রাস্তার দিকে চাহিয়া একখানা ইংরাজী সংবাদ পত্র হাতে লইয়া বসিয়াছিলেন।

দেখিলেন, দূর হইতে একটি রমণী একটী শিশুকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া সিক্ত বসনে কাঁপিতে কাঁপিতে রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে।

রমণী কর্দ্দমের আঘাতে একবার পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, আবার সে অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইতেছিল। এই সন্তান-বাৎসল্যের মধ্যে সরলা দেখিতে পাইলেন এলাহী মর্ত্ত্যে আসিয়া সহস্র দীন জননীর বেশে বক্ষে মধু লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া জলধারা নির্গত হইতে লাগিল।

সরলা আশরফ্‌কে ডাকিলেন। আশরফ্‌ দৌড়াইয়া আসিয়া কহিল,—হুজুর, কি আজ্ঞা?

মেম সাহেব বলিলেন,—রাস্তা দিয়া ওই যে রমণীকে যাইতে দেখিতেছ, উহাকে অবিলম্বে ডাকিয়া আন।

আশরফ্‌ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বাহির হইয়া গেল। সরলার ভয় হইতে লাগিল, পাছে রমণী না আসে।

আশরফ্‌ মনে মনে প্রশ্ন করিতেছিল—এই বৃষ্টির মধ্যে কি বাহির হওয়া যায়? বাড়ী থাকিয়া মোল্লাগিরী করিলেও ত মাসে বিশ কাটা হয়, কেন এ জ্বালা?

সে রমণীর পশ্চাৎ দিক্‌ হইতে ডাকিয়া কহিল,—এই রাণ্ডি, শোন্‌, সাহেব তোকে বোলাচ্ছেন। শোন্‌ শীঘ্র আয়, এক পাও এগোবি না।

রমণী ভয়ে কাঁদিয়া কহিল,—'বাবা! আমিত কোন অপরাধ করি নাই। আমি একটু রেজেষ্টারী অফিসে যাচ্ছি। আমার সেখানে না গেলেই হবে না। বাবা, আমি কোন দোষ করি নাই।'

আশরফ্ কহিল,—তবেরে মাগি! তোর এত কথা কে শুনিতে চায়! আয় জলদি করে আয়।

সরলা আশরফ্‌কে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতেছিলেন না। তাঁহার ভয় হইতেছিল, পাছে রমণী না আসে। জল কাদা না মানিয়া তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। আশরফের শেষের ক'টা কথা শুনিয়া সরলার গা জ্বলিয়া গেল।

রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছিল 'বাবা, আমি ত কোন দোষ করি নাই?'

এমন সময় সরলা আশরফের পেছন হইতে বলিয়া উঠিলেন,—শুনে যাও মা, তোমার কোন ভয় নাই। সাহেবের কুঠীতে একটু এস, তোমার লাভ ছাড়া লোকসান্ হবে না।

লাভ হউক বা না হউক রমণী মেম সাহেবের কথা শুনিয়া একেবারে গলিয়া গেল। সে আর কোন আপত্তি করিল না। ধীরে ধীরে সে মেমসাহেবের সঙ্গে বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সে খানে একখানা হাতাবিহীন চেয়ার পড়িয়াছিল। সরলা রমণীকে সেই স্থানে বসিতে বলিলেন। রমণী ইতস্ততঃ করিতেছিল। সরলা কহিলেন, 'ইতস্ততঃ করিতেছ কেন মা? ও গুলি বসিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি বস।'

রমণী কহিল, 'জি, আমি মোসলমান! ভদ্রলোকের যায়গায় কি প্রকারে বসিব?'

একেই পিছন হইতে আশরফের বিরক্তিকর ব্যবহারে সরলা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহার পর রমণীর মুখে এই হীনতার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন।

সরলা কহিলেন—'মা আমিও মোসলমান, সুতরাং আমার উপর তোমার দাবী আছে।'

রমণী বুঝিবে কি না বুঝিবে, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া সরলা কহিলেন,—মা, তুমি ত ছোট জাত নও। মোসলমানের মত শ্রেষ্ঠ জাত দুনিয়ায় তো আর নাই। যে সব অপদার্থ মানুষ তোমাদিগকে এত খাট করিয়া রাখে, তাহাদের মধ্যে কোন ধর্ম্ম নাই। তারা চোর।

তারপর তিনি আপন মনে বলিলেন—জগতের এত বড় একটা বিরাট্ শ্রেষ্ঠ ও সভ্য জাতির মানুষকে, কোন্ পাষণ্ড উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে? যে এমন কাজ করিতে পারে সে মানুষ নহে। মনুষ্যত্বের গন্ধ তাহার মধ্যে নাই। যথার্থ ভদ্রলোক আর যথার্থ মুসলমান একই কথা। মুসলমান ধর্ম্মের সর্ব্বব্যাপী শিক্ষা যেমন একজন মানুষকে একজন শ্রেষ্ঠ ভদ্রলোক করিয়া তুলিতে পারে, এমন আর অন্য কোন ধর্ম্ম পারে কি না সন্দেহ।

মেমসাহেব বাক্সের ভিতর হইতে সাড়া ও একটা মোটা গায়ের কাপড় বাহির করিয়া রমণীকে অবিলম্বে পরিতে কহিলেন।

সে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সরলা কহিলেন,—'অন্ততঃ এই শিশুটীর জন্য তোমাকে কাপড় পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভিজা কাপড়ে আর কিছুক্ষণ থাকিলেই তোমার ছেলের জ্বর হইতে পারে। এমন কি মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা! তোমার আফিসের কাজ দুইটার সময় আরম্ভ হইবে, বেলা এখন মাত্র নয়টা। তুমি ছেলেটাকে কিছু খাওয়াও, নিজে কিছু খাও। আমি নিজে তোমাকে আফিসে পাঠাইয়া দিব।'

ছেলের অসুখের কথা শুনিয়া রমণীর মুখ শুকাইয়া গেল। সে সব বিসর্জ্জন করিতে পারে, সে নিজে মরিতে পারে, পুত্রের মৃত্যু তো দূরের

কথা তাহার সামান্য জ্বর হইলেও সে তাহা সহ্য করিতে পারে না। তার ছেলের জন্যই সে বাঁচিয়া আছে, নচেৎ সে বাঁচিত না। ফতুর বাপজান হারাণ সেখ বহুদিন হইল অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর নিকট হইতে জলভরা চোখে বিদায় লইয়া সুন্দর বনে কাঠ কাটিতে গিয়াছিল। যে দিন সংবাদ আসিল ফতুর বাবাকে বাঘে লইয়া গিয়াছে, সে দিন দুপুরে খোকাকে কোলে লইয়া সে দাওয়ায় বসিয়া স্বামীর মিলনানন্দের কথা চিন্তা করিতেছিল আর আনন্দাতিশয্যে তাহার অঙ্গ ফুলিয়া উঠিতেছিল; এমন সময় সে সহসা এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছিত হইয়া উঠানে পড়িয়া গেল। সেই হইতে তাহার হাত খানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

খোকার অসুখ হইতে পারে শুনিয়া রমণী আর বাধা দিল না। সে তাড়াতাড়ি কাপড় বদলাইয়া লইল।

* * * *

বেলা এগারটা হইতে ভীষণ ঝড় বহিতেছিল। রাস্তার ধারে বড় বড় গাছগুলি উপড়াইয়া পড়িয়া গেল। যখন রাত্রি আটটা তখনও ঝড় থামিল না।

এই রমণীর বসত বাড়ীর খাজানা কয়েক বছর বাকি পড়িয়াছিল। মনিব বলিয়াছেন, এবৎসর যদি সুদ সমেত খাজানা পরিষ্কার করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাকি খাজনায় তাহার বাড়ীখানা নিলাম হইয়া যাইবে। হারাণের বউ কাঁদিয়া গ্রামের মোড়ল ওমর কাজীর কাছে যাইয়া তার বিপদের সকল কথা বলিল। ওমর বুদ্ধিমান্ লোক। তিনি পরামর্শ দিলেন হালোটের ধারে হারাণের দুই বিঘা পাটের জমি আছে তাহা বেচিয়া দেনা শোধ করা হউক। হারাণের বউ তাই স্বামীর ভিটা খানি বাঁচাইবার জন্য ২৫৲ টাকায় ওমরের কাছে

সেই দুই বিঘা জমি বিক্রয় করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এই কথাগুলি সরলা রমণীর নিকট হইতে জানিয়া লইলেন।

হারাণের বউ বড় ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া কহিল,—মা! শেষকালে ভিটাখানি ছাড়িয়া কি পথে দাঁড়াইতে হইবে! ঝড় থামিল না, ইহার পর ওমরকাজী যদি জমি না লয়, তাহা হইলে কি হইবে? ওমর কাজী জমি বিক্রয়ের কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়াছিল। আমিত বলিয়া ফেলিলাম, কোন ক্ষতি হইবে না ত? কথা প্রকাশ হইয়া গেলে, জমি আদৌ বিক্রয় হইবে না। জমির মধ্যে নাকি অনেক গোলমাল আছে ইহাও তিনি বলিয়াছেন।

কথাটা গোপন রাখিতে বলিবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে মেম সাহেবের বাকী রহিল না। সরলা বলিলেন—তা মা কি করিবে? ঝড় ত দেখিতেছ, যদি আফিসে যাইবার সুবিধা হইত, তাহা হইলে আমি নিজেই বন্দোবস্ত করিয়া দিতাম। আজ আফিসে কোন কাজ হইবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তোমার কোন ভয় নাই।

তাহার পর একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া সরলা আবার কহিলেন—আচ্ছা, তুমি যদি এই ২৫৲টী টাকা জমি বিক্রয় না করিয়াই পাও, তাহা হইলে কেমন হয়?

রমণী কাঁদকাঁদ স্বরে কহিল,—মা, আমার কি এমন কপাল হবে। আমি কোথায় টাকা পাব? আর তা ছাড়া মুখের কথা দিয়েছি।

সরলা কহিলেন,—আচ্ছা আমি তোমাকে ২৫৲ টাকা দিতেছি, কাল সকালে তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও।

রমণী সরলার হাত দুখানি মাথায় তুলিয়া লইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রাখালবালকেরা ছুটিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া আস্তে আস্তে বলাবলি করিতেছিল—ওরে মেম সাহেব যাচ্ছে। সরলা গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বাসায় ফিরিতেছিলেন।

রাস্তার দুইধারে বাঁশঝাড়গুলি মাথা নোয়াইয়া এ উহার সহিত কোলাকুলি করিতেছিল। নিকটে একজন মোসলমান তাঁতি-বধূ খুঁটার সারি গাড়িয়া সূতা পালিশ করিতেছিল। সরলা নিকটে যাইয়া কহিলেন, "এগুলি কি দিদি?"

বউটী মেমের মুখে দিদি সম্বোধন প্রাপ্ত হইয়া যেন বিনয়ে গলিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি উঠান হইতে একখানা পৈঠা আনিয়া সরলাকে বসিতে বলিল।

সরলা কহিলেন—না দিদি, আমার আর বসিবার দরকার নাই। বল এগুলি কি? রমণীর অনেকদিন বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর তিন মাস ধরে স্বামী আজিম মোল্লা তাহাকে সোহাগ করিত—তুমি আমার চোখের তারা, প্রাণের বাঁশী, জ্ঞানের জ্ঞান। আজিমের মা স্ত্রীর প্রতি ছেলের এত অধিক টান দেখিয়া, পাড়ায় পাড়ায় ছেলেকে অভিশাপ দিয়া বলিয়া বেড়াইত 'ছেলে কি এখন আমার আছে? আমি কি তাকে পেটে ধরেছিলাম? পেটে ধরেছিল ওই আবাগীর মা শাশুড়ী। যত পীরিত এখন ওদের সঙ্গে। ওমা! কি বলবো, আমরা

কি আর সোয়ামী নিয়ে বসত করিনি। লজ্জার কথা, ঘেন্নার কথা! সমস্ত রাত যদি ঘুমোয়, পেটে যে কত কথা। কেবল রাত ধরে ফিস্‌ফাস্ ফিস্‌ফাস্। এদিক ওদিক ঘোরা, আর মধ্যে মধ্যে ঘরে যেয়ে সেই হারামজাদার সঙ্গে একটু হেসে না এলে হারামজাদীর আর ভাল ঠেকে না। ওমা, কলিকালে কতই দেখবো! পারে তো সোয়ামীকে গিলে খেয়ে ফেলে। আবাগী আর আবাগীর মা আমার আজিমকে যাদু করেছে। আজিম ত আগে এমন ছিল না। আগে দিনের মধ্যে একশবার মা, মা, করে ডাকতো, এখন একবার ভুলেও কোন কিছুর জন্য ডাকে না। জল আন, ভাত দেও, সবই ওই বউ!'

তাহার পর যখন প্রেমের বন্যা শুকাইয়া গেল, সংসারের কঠিনতা আসিয়া প্রেম ও চুম্বনকে স্বপ্ন ও ছেলেমী কাজ করিয়া তুলিল, তখন আজিমের মাতৃভক্তি অত্যন্ত প্রবল। আজিম শলা, বাতুন, লাঠি, বউয়ের পিঠের উপর ভাঙ্গিয়া মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। মায়ের মুখে এখন ছেলের প্রশংসা ধরে না। বিবাহের একমাস পরে বউ যখন স্বামীর জন্য তামাক সাজিতে যাইয়া সাধের বোম্বাই সাড়ীখানির আঁচল পোড়াইয়া ফেলিয়াছিল, সেদিন আজিম বলিয়াছিল, যাক কিছু মনে করো না, মনে করো তোমার সাড়ীখানি আমার হাতে পুড়ে গেছে।" আর সেদিন সে ম্যাচবাক্সের কাঠি ফেলিয়া দিয়াছিল মাত্র দুটা, আজিম লাঠির আঘাতে স্ত্রীর পিঠ ভাঙ্গিয়া দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করে নাই। বিবাহের পর আজিম যখন তাহাকে 'চোখের তারা' বলিত তখনও বউ কোন উত্তর দেয় নাই, এখন যে তাহার পিঠে শলা ভাঙ্গিয়া যায় এখনও সে কোন উত্তর দেয় না। কেবল ঘোমটার ভিতর তাহার চোখ হইতে অনবরত অশ্রু ঝরিতে থাকে।

মানুষ কি তাদের বুকের ধন আদরের পুতলী মেয়েগুলিকে শুধু

ভাত রাঁধা উঠান ঝাড়া আর রস জ্বাল দিবার জন্যই পরের বাড়ী পাঠায়। না, আরও কোন কিছুর জন্য; যাহা মা বাপ দিতে পারে না।

বউটী কহিল—এগুলি দিয়ে কাপড় বোনে।

সরলা কহিল—আচ্ছা আমাকে একখানা কাপড় বুনে দিতে পার দিদি?

বহুদিন কাহারও মুখে সে এমন মধুর আলাপ শুনে নাই। তাহার ক্ষুদ্র দীন হৃদয় প্রেমে ভরিয়া গেল। সে কহিল,—দিদি তোমরা এ মোটা কাপড় পরতে পারবে না।

সরলা কহিল,—কেন পারব না দিদি? কাপড় যত মোটা হয় ততই ত ভাল। আমাকে একখানা কাপড় বুনে দিতেই হবে।

এমন সময় আজিমের মা বাহিরে আসিয়া দেখিল এক মেমসাহেব তাহার বউয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। সে নিজকে ভাগ্যবতী মনে করিয়া কহিল,—মা, আমাদের বড় ভাগ্য! দয়া করে আমাদের বাড়ীর ভিতর আসুন।

সরলা দ্বিরুক্তি না করিয়া কহিল—চল মা চল। তাহারপর আজিমের বউকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—চল দিদি চল, আজ হতে তুমি আমার দিদি।

আজিমের বউ বহুদিন যাহা অনুভব করিতে পারে নাই, আজ তাহা অনুভব করিল। আনন্দে, পুলকে ও প্রেমের স্পর্শে তাহার পরাণের সমস্ত আবিলতা, সমস্ত দুঃখ মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন দূর হইয়া গেল। নিতান্ত আত্মীয়ার মত সে দৌড়াইয়া বাড়ীর মধ্যে যাইয়া একখানা পাটী পাড়িয়া দিল এবং মেমসাহেবকে বসিতে অনুরোধ করিল।

সরলা তাহাদের সাংসারিক অবস্থার কথা, সুখ দুঃখের কথা, আরও কত কি জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেক কথার পর আজিমের বউ সরল

প্রাণে প্রাণমাখা স্বরে সরলাকে কহিল,—দিদি, আমার সঙ্গে যখন দয়া করে এত আলাপ করলেন, তখন আমার হাতের কিছু আপনাকে খেতে হবে। শুনেছি, আপনারা সকলের বাড়ীই খান, তাই জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাচ্ছি।

মেমসাহেব হাসিয়া কহিলেন,—বেশ ত! বেশ ত! শুধু মুখের কথায় কি দিদি হওয়া যায়। যা আছে আন।

আজিমের বউ ঘরের মধ্যে মাচার উপর কোলার ভিতর হইতে টাটকা মুড়ী লইয়া আসিল। ছিকের উপর নূতন হাঁড়ীর ভিতর পাটালী ছিল। বড় বড় দুই খানা পাটালী আনিয়া সে সরলার সম্মুখে দিল।

মেমসাহেব গল্প করিতে করিতে মুড়ী আর পাটালী উদরসাৎ করিতে লাগিলেন।

আরও অনেক কথার পরে সরলা কুঠীর দিকে রওনা হইলেন। আসিবার সময় বলিয়া আসিলেন—দিদি তোমার সঙ্গে আমার দিদি পাতান হলো, মাঝে মাঝে আসব।

উপসংহার।

—o—

সরলার দুই একটি চুল পাকিয়া গিয়াছে।

সে কতকাল আগেকার কথা—যেদিন বিলাসের নিকট সরলা বিদায় লইয়াছিল।

সেদিন সুরেন বাবু মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। বৈকাল বেলা নিবিড় কাল মেঘে আকাশ ঢাকা। উদ্দাম বাতাস গম্ভীর গর্জ্জনে পৃথিবী ও শূন্যকে শাসাইয়া যাইতেছিল। বিক্ষুব্ধ উত্তাল-তরঙ্গের মত শূন্য যেন দোলিত হইতেছিল।

সরলা ঘরের এক দরজা খুলিয়া প্রকৃতির এই ভীম দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন—সে কতকাল আগেকার কথা—বিলাসের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছি। সমস্ত জীবন চলিয়া গেল, কই বিলাস ত আসিল না। সে কি তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবে না? সে কি মিথ্যা কথা বলিয়াছিল?

সরলা বাতাসের কোলাহলের মাঝে শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন।

* * * * *

সরলা কহিতেছিলেন,—

হে পিতা! হে জননি! হে শিশু! হে মহাশক্তি! তুমি আমাদিগকে জ্ঞান দাও। তুমি বিরাট্। তুমি ছোট—সজীব। হে পিতা, আমরা নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও তোমার করুণা হইতে বঞ্চিত হইব না। হে সুন্দর!

হে অনির্ব্বচনীয় সুখের আধার! আমাদের ভুল দলিয়া দাও। হে ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। হে খোদা তোমার ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা হউক।

*　　*　　*　　*　　*

রাত্রি তখন নয়টা। সরলা তেমনি করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছেন। ঝি আসিয়া কহিল,—মেম সাহেব, এক মুসলমান ফকীর এসে আপনাকে ডাকছেন।

সরলা কাঁদিয়া উঠিলেন।

ঝিকে সেখানে দাঁড়াইতে বলিয়া সরলা দ্রুতবেগে বাহিরে গেলেন।

*　　*　　*　　*　　*

সরলা বাতির আলোকে ফকীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত আবেগে রুদ্ধ গলায় কহিলেন—বিলাস! বিলাস, এসেছ? তোমার দাসীর জন্য, তোমার প্রিয়ার অন্বেষণে অঙ্গে ছাই মাখিয়া সন্ন্যাসীর বেশে সারা বিশ্ব ঘুরেছ।

ফকীরের চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছিল। ফকীর কহিলেন—সরলা, আমি আর এখন বিলাস নহি। আমি আব্দুল্লাহ। আজ সাত বৎসর মুসলমান হয়েছি।

সরলা ফকীরের গলা ধরিয়া দ্বিগুণ আবেগে কহিলেন,—স্বামিন্! বিলাস! তুমি মহামানুষ মোহাম্মদের মহামানবতাকে বিশ্বাস করেছ। কোন মহাপুরুষের স্পর্শে এসে তুমি মহাসত্য এসলাম পেয়েছ। আমিও সরলা নহি। আমি ফাতেমা। আজ চৌদ্দ বৎসর ভুলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখেছি। আমিও এসলামের সেবক, বিশ্বাসকে মনের ভিতর লুকিয়ে মিথ্যা আবরণে নিজকে ঢাকতে বাধ্য হয়েছি।

ফকীর কহিলেন,—'বাহির হইয়া পড়ো।'

ফাতেমা কহিলেন,—'আচ্ছা'

ঝড়ের বেগে মেম সাহেব ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতি ক্ষিপ্র, তিনি একখানা কাগজ লইয়া তাহার উপর লিখিলেন—

"প্রিয় দাদা, সুরেন বাবু! আমার স্বামী আমাকে লইতে আসিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী, আমি এক মুহূর্ত্তও দেরী করিতে পারিলাম না।"

আপনার বোন ও দাসী,

সরলা।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরলা মাথার টুপী দূরে ফেলিয়া দিলেন। বাক্সের মধ্য হইতে সেই অতি পুরাতন জীর্ণ বসন পরিয়া লইলেন। গাউন, সাড়ী মেজের উপর ছুড়িয়া ফেলিলেন। পায়ের জুতা ও মোজা খুলিয়া ফেলিলেন। হাতের আংটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর পাশ বই খানা, মিঃ মর্গো প্রদত্ত পাঁচশত সুবর্ণ মোহর লইয়া সরলা ভিখারিণীর বেশে বাহির হইয়া পড়িলেন। দরজার বাম পার্শ্বে চিঠির বাক্স, সরলা চিঠিখানি বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন এবং পশ্চাতে দণ্ডায়মানা ঝির হাতে দুইটি টাকা দিয়া কহিলেন—মা! আমার স্বামী এসেছেন, আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করবার উপায় নেই! এক টাকা তুমি নেবে, এক টাকা আশরফ্‌কে দেবে।

ঝি কহিল,- হুজুর আপনার এ মলিন বেশ কেন? ভিখারিণীর বেশে আমাদিগকে ফেলে কোথায় যাচ্ছেন?

সরলা কহিলেন—মা! স্বামী আমার সন্ন্যাসী, ফকীর-পত্নীর ইহা অপেক্ষা ভাল বেশ শোভা পায় না। তোমাদিগকে ফেলিয়া যাইতেছি না, স্বামীর আজ্ঞা পালন করিতেছি মাত্র।

ফকীর ফটকের ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। ফাতেমা নিকটে যাইয় কহিলেন—তোমার কোরাণখানা আমার হাতে দাও।

আবদুল্লা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ও ছবিখানা কার?

ফাতেমা বলিলেন—আহম্মদের, ইনি আমার গুরু।

তার পর তারা অন্ধকার ও বাতাসের মাঝে মিশে গেল।

*　　*　　*　　*　　*

অনেককাল পরে নিশাপুরের জমিদারেরা বলিতেন,—

শাহ আব্দোল্লা এবং তদীয় পত্নী ফাতেমা দেবীর বংশ তাঁরা। তাঁর মোগল বাদশাহের সময় আরব দেশ থেকে এসেছিলেন।

———